গল্প, গল্প নয়

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

—আড়াই টাকা—

১ম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৫৩

মুদ্রাকর . শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

উপহার

....

....

....

....

....

বাংলাদেশের "বাণী" ও "বউ-বাণীদের" আগ্রহে 'গল্প, গল্প নয়' এব সূচনা। এই বইয়ের কয়েকটি গল্প ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, উদয়ন, দেশ প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অপর গল্প কয়টি আমার নূতন লেখা।

এ পুস্তক প্রণয়নে যে সব মহানুভব মনীষীর শুভেচ্ছা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, তন্মধ্যে বাণী ও কমলার বরপুত্র, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত এস, এন, দত্ত এবং স্নেহাস্পদা শ্রীমতী বেলা চৌধুরাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন সহকারে বইখানি ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন, এজন্য তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অলমতি বিস্তরেণ।

"কল্পনা
শিলং
পয়লা ভাদ্র, ১৩৫৩ }

হেম

উৎসর্গ

৺ননীবালা দেবী
শ্রীনগেন্দ্রবালা দেবী
শ্রীইন্দুবালা দেবী

৺সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপরিমল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবেলা দেবী
শ্রীআরতি দেবী
শ্রী .. . .

আমার ভাই-বোন, 'তুমি'ও বৌমাদের
করকমলে,—

ছয়গাঁও
ফরিদপুর
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

হেম

গল্প, গল্প নয়

পরের ছেলে

"অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে—"

নীলার দিদি

মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাব

দুর্ঘটনা

দেশের মায়া

কেরাণীর দুর্গোৎসব

বিহারী পিয়ন অনেকদিন ধরে রূপডাঙার পোষ্ট অফিসে কাজ করছে, একথা ইন্সপেক্টর অমৃতবাবুর কাছে অনেকদিন শুনেছি। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, একটু কাদা হয়েছে কিন্তু, সাবধানে পা ফেলে যাবেন।

এ জেলায় এই নূতন এসেছি, পথঘাটের সাথে ততটা পরিচয় ছিল না। তবে বাঙলাদেশের ছেলে, আসামে পড়ে থাকলে কি হবে, একটা আঁচ ছিল মনে। ধীরে ধীরে ধাপ-কাটা তীরের কাঁচা কাদার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম। হরিপদবাবু কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলুম—পোষ্টমাষ্টারবাবু, পোষ্ট অফিস কত দূর এখান থেকে?

হরিপদবাবু বললেন, কাছেই,—বাবুদের বাড়ীতে পোষ্ট অফিস,...এই বলে' কত আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে, কত ঝোপঝাড়ের আনাচে-কানাচে উঁচু উঁচু বন-মাকালের রাশি রাশি ঝরে-পড়া ফুল পায়ে দলে আমবাগানের কাছ দিয়ে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলেন।

অপরিসর পথের দুই ধারে সে কি করুণ সুর সুরু হয়েছে, খুব সম্ভব কোন ঝোপেঝাড়ে কোন অদৃশ্য পতঙ্গের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট গ্রামখানির ঘরবাড়ী, বনজঙ্গল চোখে যা পড়ল, কিছু কিছু দেখে নিলুম।

দশ পনেরো মিনিটের পথ অতিক্রম করে এসে পৌছলুম বাবুদের বাড়ীতে, তারই কাছাকাছি একটি জায়গায় পোষ্ট অফিস, মাষ্টারবাবুর কোয়ার্টার, মেহেদির বেড়া-দেওয়া খানিকটা জমি।

অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখি, সুমুখটা ভীষণ ফাঁকা, সাদা কুয়াসার মত ঝাপ্‌সা কি যেন একটা নদীর মত দেখা যাচ্ছে এবং ক্ষুদু ক্ষুদু কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললুম, এ কিসের শব্দ হরিপদবাবু?

হরিপদবাবু বললেন, এই যে লক্ষ্যা নদী, রূপডাঙা লক্ষ্যার তীরেই,…

আমার ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা সম্বন্ধে হরিপদবাবুর কোন সন্দেহ হয়েছিল কিনা জানি না, কোন মতে বললুম, তা'হলে আমরা অনেক ঘুরে এসেছি।

হরিপদবাবু জবাব দেবার আগেই বয়োবৃদ্ধ বেহারী পিওন বললে, না হুজুর, ঠিকই এসেছেন, বর্ষাকালে নদীতে বড় রাগ বাতাস থাকে, সাধ্য আছে কারও নৌকা ধরে এ সময়!

অথচ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, সারি সারি মহাজনী নৌকা, ইলিশ মাছের ডিঙি, গয়না নৌকা ঢেউয়ের তালে হেলেদুলে চলে যাচ্ছে। তবে সেদিন যে ঢেউ ছিল, আমি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেতাম।

জমিদারবাবুদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। লোকমুখে শোনলুম, বৃদ্ধ প্রতাপবাবু গত হয়েছেন, তাঁরই ছেলে অবিনাশ বাবু এখন জমিদার। তিনি কালেভদ্রে গ্রামে আসেন, থাকেন ঢাকায়, কোলকাতায়, আর ঘুরে ফিরে বেড়ান দেশ-বিদেশে। কাঁচা বয়স, বড জোর সাতাশ আটাশ কি ত্রিশের কাছাকাছি। সখের প্রাণ, সংসারের ধারও ধারেন না, হেসে-খেলে দিন কাটান। দেশের বাড়ীতে শুধু তার মা, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, লোকজন আমলা-কর্ম্মচারী, দাসী-ঝি, পাইক, বরকন্দাজ পিয়াদা এবং আরও দশজন বড়লোকের সংসারে প্রতিপালিত হয়।

নদীর তীরে ছবির মত গ্রামখানি, বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রকাণ্ড গঞ্জ, বড়লোকের অন্ত নাই। দু'তিন দিন এখানে থাকব ভাবলুম।

সেদিন ছিল রবিবার। হাতে কোন্ কাজ ছিল না। বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। অন্দর থেকে খবর এলো, আপনাকে

একবার ডাকছেন কর্ত্রী-মা। রৌপ্যশুভ্র কেশরাশির অকালপক্কতায় ম্যানেজার যামিনীবাবুকে আরও দশ বছরের বেশী বয়সের বুড়ো মনে হচ্ছিল। তিনি হেসে বললেন, উনি আপনার মায়ের বয়সী, আর বৌমা নাকি আপনাকে চিনতে পেরেছেন। আপনি কি কখনও লেবঙে ছিলেন?

...লেবঙ! অবাক হয়ে বললুম, সে তো আমার জন্মভূমি। হয়ত সেখানকার কেউ হবেন, মনে মনে ভাবলুম। ম্যানেজারবাবুর সাথে ভিতরে গিয়ে দেখি, একখানি রঙীন আসন পাতা, সুমুখে দাঁড়িয়ে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে আমারই অপেক্ষা করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে একটি ঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে চেয়ে দেখছে।

ম্যানেজারবাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

অনেক কথাবার্তা হ'ল। শেষে মিষ্টিমুখ না করিয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না। বৌমাও এলেন একটু পরেই। ঘোমটার ফাঁকে একটুখানি চেয়ে আমায় প্রণাম করলে এবং পরক্ষণেই হেসে বললে, কি বুলুদা, আমায় চিনতে পাচ্ছেন তো? আমি রমলা।

...র-ম—লা! কেমন আছো, ভালো?

—ভালো, বলেই রমলা লেবঙের সব কে কেমন আছে, পাড়ার, সহরের কারও কথা সে বাদ দিলে না। আমি ধীরে ধীরে যতটা জানি বলে গেলুম। শুনলুম, পাঁচ বছরের ভিতর রমলা আর লেবঙে ফিরে যায় নি। ওর বাবা-মা নাকি এখন কোলকাতায়, আর বোনেরা সব কোথায় কি বললে।

রমলাকে দেখে খুব ভালো লাগল। লেবঙে থাকতে সে যতটা

ফর্সা ছিল, বাঙলাদেশের জলবায়ুতে এসে যেন তা একটু মলিন হয়ে গেছে। তবে ও ফর্সা, খুব গৌরবর্ণ, একথা কোনদিন বলা চলেনি। লেবঙে থাকতে ওর গুণপনা, দোহারা চেহারা, সুন্দর গড়ন, ভাসা-ভাসা দুটি ডাগর চোখ, চোখে মুখে অতি সুন্দর, স্নিগ্ধ একটি মধুর শান্ত ভাব, যা' আমার জানাশোনা ঢের ঢের রূপসী মেয়েদের মুখে কোনদিন চোখে পড়েনি। এই সব দেখে-শুনে আমি ওকে ছোটবোনের মত ভালবাসতুম। আমার নিজের ছোটবোনেরা কেউ থাকে সিমলায়, কেউ এলাহাবাদে, তাই রমলাকে কল্পনায় ছোটবোনের মত ভালোবেসে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নিতুম।

রমলা যখন ছিল আরো ছোট, ওর দিদির সাথে ছিল আমার আলাপ-পরিচয়, রমলা ও তার দিদির সাথে মাঝে মাঝে দেখা হযে যেত সেই লেবঙের মাঠের ধারে, আমরা কত কথা বলেছি, রমলা চুপটি করে শুনে যেত শুধু, তারপরও বড হয়ে রমলার সাথে কম দেখা হয়নি। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে যখনই যেখানে গিয়েছি, তার সেই অভোল-ভোলা হাসিটুকু নিয়ে সে ছুটে গেছে আমার আশেপাশে, কথা বলতে কেন জানি তখন একটু সঙ্কোচবোধ হ'ত। তবু আমি তাকে অন্তরের সাথে স্নেহের চোখে দেখতুম, ভক্তি করতুম, শ্রদ্ধা করে দেখেছি মন-প্রাণ এক অজানা, অসীম আনন্দে ভরে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যখন পাহাড়িয়া পথে নির্ঝরিণীর ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি, রমলার কথা খুবই মনে পড়ত, মনে মনে ভগবানকে কতবার বলেছি, ওগো বিধাতাপুরুষ, তোমার যদি এতটুকু ক্ষমতা থাকে, তবে রমলাকে আমার দেহের বর্ণে বিভূষিত করে দাও, আর আমাকে দাও ঠিক তারই গায়ের রঙ। আমি পুরুষ মানুষ, একটু ময়লা রঙ হ'লে এমন কি আর আসে-যাবে। পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি রমলার গুণপনার

কথা, বিজয়গর্বে আমার বুকখানি ভরে উঠেছে, কাউকে বলিনি এসব কথা,—আমার ভালোবাসা, আমার বুকভরা অসীম স্নেহ ছোট বোনটির জন্য যা' যক্ষের ধনের মত দিনের পর দিন পুঁজি করে রেখেছিলুম, তা হয়ত চিরদিন অব্যক্ত হয়েই থাকবে বলেছিল। কিন্তু জগতের নিয়ম তা নয়। নিশ্চয়ই একদিন বাঞ্ছিতের প্রাণের সাড়া কোন না কোন সময় না পাওয়ার কোন কারণই নেই, আজ রমলার মুখে সেই মিষ্টি ডাকটি কী যে ভালো লাগল, তা বোঝবার স্থান এখানে নয়।

'বুলুদা,' কি মিষ্টি ডাক।······আমার ভয়ানক ভুল হতে লাগল,—আমি কি লেবঙের সেই বুলুদা,······না, ডাক ও তার বিভাগের······

ওর সাথে যে এমনিভাবে এত দূরদেশে আবার দেখা হবে, তা আমার কল্পনার অতীত। আমার ধারণা ছিল, রমলার হয়ত কোন আই-সি-এস কিংবা আই-পি-এসের সাথে বিয়ে হয়ে থাকবে। আর ও যা' চমৎকার মেয়ে, কেউ জানলে ওকে লুফে না নিয়ে ছাড়বে।

আমি ফিরে আসব ভাবছি, আবদারের স্বরে রমলা বললে, বসুন না বুলুদা', কতকাল পরে দেখা, জানেন, বোনেরা ভাইদের কথা সহজে ভোলে না, ভায়েরাই খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

রমলার শাশুড়ী একটুখানি হেসে বললেন, ব'সো না বাবা, এত ব্যস্ত কিসের ? কাজ ত চিরদিনই থাকবে, কাজ ছাড়া মানুষ এক দণ্ড স্থির থাকতে পারে, এই ত দেখ না কত কাজ করে এলুম।

সময়োচিত একটি কথার জবাব দিয়ে চুপ করে আবার বসে পড়লুম। রমলার শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, বৌমা আজ রাত্রিতে কিছু ভালো রান্নাবান্না করে দাদাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু। কত রকমেরই যে রান্না জানে বাবা, সে আর কত বল্‌ব তোমাকে। ইলিশ মাছের

ডিমের কাটলেট, আমের মোরব্বা, চিংড়ির চপ, সর ভাজা, ক্ষীরপুলি, ······মাংসের পোলাও,······মাছের ডালনা······

মনে মনে ভাবলুম, রমলা এসব কি করে জানে,—ধনীর দুলালী, চিরদিন ত ছিল বইয়ের পোকা, হেসে খেলে নেচে বেড়িয়েছে, সে কি আর রান্নাঘরের কোন খোঁজখবর রেখেছে।

রমলা মৃদু একটুখানি হেসে চুপ করে রইলো।

রাত্রিবেলা সে কি খাওয়ার ধূম, যত্নআত্মি করে সে আমাকে খাওয়ালে, তার হাতের তৈরি সেই অমৃতি, ছানার পায়েস আজও যেন মুখে লেগে আছে। আর কি চমৎকার পরিবেশন করতে শিখেছে রমলা, কত রকমে কথা বলে গল্প করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কত সে খাওয়ালো আমাকে,—আমি কিছুতেই না বলতে পারিনি।

পরের দিন সহরে ফিরে আসব ভেবে দেখা করতে গেলুম। চোখ দুটি জলে উপচে উঠেছে দেখে সেদিন নৌকার মাঝিকে বিদায় দিলুম। পরদিন স্নেহের ছোট বোনটিকে কোনমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরে এলুম সহরে।

মোটে তিন ঘণ্টার পথ সহর থেকে রূপডাঙা। রূপডাঙার কথা, রমলার কথা, আর সেই মাতৃ-সমা রমলার শাশুড়ীর কথাও ভোলবার নয় আবার। বছর শেষ হয়ে আসছে, সব পোষ্ট অফিস পরিদর্শন শেষ করতে হবে এরই ভিতরে। কিন্তু রূপডাঙা থেকে "মা" এমন তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে, টুয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওকে আমি মায়ের মত দেখি, তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে সেই দু'দিনে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রবাসে ছোট ভাই বোনের স্নেহ, জননীর অসীম করুণা কোথায় পাওয়া যায় আর! যৌবনের তৃষিত হৃদয়টি

অজানার স্নেহের টানে আকুল হয়ে উঠেছে, কার সাধ্য কে তাকে ধরে রাখবে!

দোটানায় পড়েছিলুম, কোথায় যাই, কি করি—এমন সময় শরতের এক উজ্জ্বল প্রভাতে ম্যানেজার যামিনী বাবু স্বয়ং স্মিতমুখে আমার দুয়ারে এসে উপস্থিত হলেন।

অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলুম, কি সংবাদ ম্যানেজার বাবু?

যামিনী বাবু রহস্য করে বললেন, সন্দেশ নিয়ে এসেছি, যাবার আমন্ত্রণ। বলেই টিফিন কেরিয়ার থেকে কলাপাতার পুঁটলি বাঁধা কি সব খাবার জিনিষ তিনি বের করে বললেন, বৌমা আর কর্ত্রীমা কাল সারাদিন রাত্রি দশটা অবধি বসে এসব তৈরী করেছেন। তক্তি, গঙ্গাজলী, ক্ষীরপুলি, কমলাসন্দেশ, চিরাজিরা, নারকেলের চম্পাপুলি……

কোনমতে বললুম, আজই যেতে হবে নাকি, না কাল……

যামিনী বাবু মাথা নেড়ে বললেন, কাল হলেই আবার কাল হবে! আজই যাবার কথা বলে দিয়েছেন। কাল বোধন, তার উপর আবার বাবু আসেননি, আসবেন কি না তারও ঠিক নেই! কাশ্মীরে ছিলেন, লিখেছেন, অমৃতসহর যাবেন।……

এ এক খেয়ালী লোক মশায়। ঘরে মা, স্ত্রী যার আশাপথ চেয়ে রয়েছে, তার মন কিনা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়……

জিজ্ঞাসা করলুম, সত্যি, তা হলে আসবেন না? মা আনন্দময়ী এসেছেন, আর বাংলার ছেলে পড়ে থাকবে বিদেশে, এ কেমন কথা ম্যানেজার বাবু?

যামিনী বাবু সে সব কথায় কান না দিয়ে বললেন, রেখে দিন মশায়, আদার বেপারীর জাহাজের খবর! বড়লোকের আবার দোল

দুর্গোৎসব। ঘরে মাণিক থাকতে যারা কাঁচের আশায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের আবার পূজো-পার্বণ। ছিলেন মানুষ একজন, তিনি স্বর্গে গেছেন, বুড়ো বাবুর কথা আর কি বলবো! যাকগে এ সব বাজে কথা! আপনি বিকেলে তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি বৌমার ফুটফরমাস্ সব সেরে আসি। মা লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে, পাড়ার যত গরীব ছেলেরা আছে না মশাই, তাদের দুঃখে ওর চোখে জল আসে। ওর চোখের জল আর বুড়ো বয়সে সহ্য হয় না যে,……আরও কত কি তিনি বিড় বিড করে বলে গেলেন, আমি সব কথা ভালো বুঝতে পারলুম না।

"চোখের জল," "দুঃখ" এসব কি বললেন তিনি, মনের ভিতর যেন খচ্ করে একটা ব্যথা ফুটে উঠল। দুর্ভাবনার হাত থেকে এডাবার জন্য বাজারের দিকে একবার বেডিয়ে পডলুম। কিছু কাপড জামা কিন্‌তে হবে ত!

রূপডাঙা পৌছাতে আমাদের একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। নদীর তীরে যেন ছেলেমেয়েদের হাট বসে গেছে। এদিক পানে কোন নৌকা তীরের দিকে বেয়ে আসতে দেখলেই ছেলেমেয়েরা সমস্বরে কোলাহল করে উঠে, নন্তু কাকা এসেছে, চুণীমামা এসেছে, কেউবা বলে বাবা আসবে দেখো নিশ্চয়ই, কেউবা বলে ছোড়দার মত দেখা যাচ্ছে না, ওই যে গলুইয়ের কাছে বসে আছেন……শেষে নৌকাখানি যখন এসে তীরের কাছে দাঁড়ায়, ছেলেদের মুখখানি হয়ে যায় কালো, কারু মুখে হাসি ফোটে,—এমনি করে পঞ্চমীর সন্ধ্যা কেটে গিয়েছে।

তীরে মহাবীর বরকন্দাজ আলো নিয়ে বসেছিল দাদাবাবুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে। বেহারী পিয়নও কি জানি কি ভাবে খবর পেয়ে

এসেছিল। বাড়ীতে গিয়ে দেখি লোকজনে বাড়ীখানি গম গম করছে। যত রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনের ভিতর পড়ে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললুম।

মা এলেন ছুটে, কুশল প্রশ্নের পর কত কথা বলে যেতে লাগলেন, অবিনাশ আসেনি, একটু দুঃখ করলেন। আমাকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন, বললেন। আরো বললেন, রমলার কথা, "দাদা, দাদা" বলে কি ব্যাকুল হয়েছে সে। এত দূর দেশে বাপের বাড়ীর কাউকে সহজে দেখ্তে পায় না সে, দাদার জন্য তার মন কেমন করে! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রমলা এসে হাজির, কোন রকম সঙ্কোচ কিংবা দ্বিধা না করে সে আমাকে অনুযোগ করে বললে, ম্যানেজার বাবু না গেলে বুঝি আপনি আসতে পারেন না?

আমি সস্নেহে ওর ঝাঁকড়া গুচ্ছ কেশরাশির ভিতর আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললুম, অফিসের কাজ করতে হয় না বুঝি, কাজের ঝামেলায় আসতে পারিনি।

সে কোন কথা শুনতে চায় না, বললে, আমি করে দিতুম। আমি বাবার কম কাজ করে দিয়েছি!

হেসে বললুম, আচ্ছা তুমিই করে দিয়ো।

যে কদিন ছিলুম সেখানে, পূজোর হৈ-হৈএর ভিতর দেখেছি, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত দশহাতে লোকজনের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা, কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি, এত ভাল লাগছিল আমার, মনে হল এই কি লেবঙের সেই রমলা, যার সম্বন্ধে আমার একটা আভিজাত্যের অদ্ভুত ধারণা ছিল,—সে সব গেছে দূরে! আর তার কি মনের ফুর্তি, আরতির সময় জগাই ঢুলী যখন নেচে নেচে তালে তালে গাঁয়ের ছেলেদের সাথে জোরকাটিতে বাজনা সুরু করেছিল, সে আমাকে বললে, আপনি

হাতে তালি বাজিয়ে সুর দেন না কেন দাদা, ছেলেরা তালে তালে নাচতে পারছে না যে!

আমি বললুম, ছোট ছেলেরা অত সুর তালের কি বোঝে বলো! সে শাসনের সুরে আমায় তক্ষুনি বললে, পারে না না হাতী, আপনি একটু দেখিয়ে দিন না?

আমি ফস্ করে বললুম, আমি পারি না রমলা, আমার বুঝি লজ্জা করে না।

রমলা আমার কথা শুনে খুব হাসতে থাকে, ওদের পাড়ার আর একটি নূতন বউ কনকের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, শুনেচ কিনুদি' দাদার কথা, আমার বাজনা শুনে ইচ্ছে করচে একটু আরতি নৃত্য দেখিয়ে দিয়ে আসি, আর দাদা পারে না,…… বলেই সে আরো হাসতে লাগলো।

কিনু তাকে বললে, সে জন্য হাসবার কথা হল কিসে?

রমলা কি কারও কথা শোনে, তার হাসি আর থামে না যেন।

এই হাসি কান্নার মাঝখানেই সংসার!

বিজয়ার পর থেকেই দেখেছি ওর চোখ দুটি কেমন ছল ছল করছে।

মনে বড় দুঃখ হল, কা'কে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, এমন সময় কিনু আমাকে একদিন কথায় কথায় বললে, জানেন, "ও" আজকাল এত মনমরা হয়েছে কেন! অবিনাশবাবুর ব্যবহারে এমন হয়েছে। বাবা মাতো ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন, অদৃষ্টে সুখ নেই তা আর কি করা বলুন।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। কেন কি হয়েছে, অবিনাশ বাবু কেন এমন করেন, শুনেছি তিনি শিক্ষিত, রূপবান, গুণী।

কিনু বললে, সে সব ত বুঝলুম। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া আর কিছু আছে বলতে পারেন। খাওয়া-পরা, মান-সম্মান, সবারই

জন্য দায়ী স্বামী। সেই স্বামী যদি অবহেলা করে, তা হলে······আর সে বলতে পারলে না······

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে বললুম, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। অবিনাশ ত খুব ভালো ছেলে শুনেছি। শিক্ষিত ছেলের কাছে অন্যায় কিছু আশা করতে পারি না যে,······কি হয়েছে, বলনা আমায়? তুমি ত আমার ছোট বোনের মত।

কিনু লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে সব কথা বলে যেতে লাগলো, শুনে আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো একেবারে। কি মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, কিন্তু রমলার মুখের হাসি দেখে কে বিশ্বাস করবে যে তার জীবনের উপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেছে।

কিনু বলতে লাগলো,······অবিনাশ বাবুর যখন বিয়ে হল, রমলাদির নামে ছিল অজ্ঞান। উনি তখন এম-এ, ল পড়তেন কোলকাতায়। বছরখানেক খুব সুখেই কেটেছে। কেউ কাউকে ছাড়া সহজে থাকতে চায় নি। রমলাদি' কলকাতায় গিয়ে থাকবেন এও কথা হয়েছিল। কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে তিনি রইলেন দেশের বাড়ীতে। এখন হয়েছে কি জানেন? অবিনাশ বাবুর মতিগতি এখন অন্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যানেজার বাবু গিয়েছিলেন, রমলাদি গিয়েছেন, কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। মাসীমা কত কান্নাকাটি করেছেন ছেলের কাছে, অবুঝ ছেলে তা ভাল বুঝতে পারলে না। কিন্তু বুঝবে একদিন যখন মোহ টুটে যাবে, ভুল ভেঙ্গে যাবে। আচ্ছা বলুনতো, মেয়ে মানুষের এর চেয়ে আর কি দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে?

—কিছুই না, বলে চুপ করে রইলুম।

কিনু বললে, তবু রমলাদিকে ধন্য মেয়ে বলতে হয়। আমরা হলে

বেঁচে থাকতে পারতুম কি না সন্দেহ। তা না হলে দেখলেন তো পূজার সময়টা যেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল।

...আমিও ঠিক যেন জগন্মাতার মূর্তি ওর চোখে মুখে দেখতে পেয়েছিলুম, যেদিন রমলা কাঙালীদের খাওয়ালে, বোধ করি নবমী পূজোর দিন না ?

কিন্তু আরো অনেক গল্প বলতে সুরু করলে, জানেন, মাসীমা রমলাদি-কে ঠিক নিজের মেয়ের মত দেখেন, বলেন আমার মেয়ে নেই একটিও, এইত আমার মেয়ে,—সত্যি তাই! দেখেছেন ত মেয়ের মত রমলাদি কি এ বাড়ীতে থাকেন না ?

কি যে জবাব দেব ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলুম না, এমন সময় রমলা এসে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বললে, বেশতো আপনি দাদা, কিছু খাবেন না এখন ? সেই কখন খেয়েছেন, মনে আছে ? বলেই একখানি রূপার রেকাবীতে ফলমূল মিষ্টিতে ভর্তি আমার সুমুখে রেখে ধপ্ করে পাথরের মেঝেতে চুপ করে বসে আবদারের সুরে বললে, সব না খেলে আমি আজ আর ছাড়বো না, রোজ রোজ সব ফেলে উঠে যাওয়া হয়, না ? আমি এ ক'দিন আর তেমন খোঁজখবর করতে পারিনি। পূজার ঝামেলা, বুঝতে পারেন তো ?

কিসের ঝামেলা, বুঝতে পারি কি না পারি, রমলা কি সে সব কথার কোন ধার ধারে। ভয়ে ভয়ে প্রায় সবটাই খেয়ে ফেল্লুম। না খেলে ও কোন কথা শুনবে না আমার। খামকা ওর মনে দুঃখ দিতে মন চাইল না যেন! এমনি বেচারী জগতে কারও কাছে এখন আর স্নেহ, মমতা, মায়া দরদ কোন কিছুরই প্রত্যাশা করে না সে, ওর মনে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

কোজাগরী রাত্রিতে আমরা সবাই দল বেঁধে লক্ষ্যার বুকে নৌকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। হেসে হেসে নেচে খেলে ঢেউগুলি ভেসে যাচ্ছিল, আমাদের নৌকার তলায় আঘাত পেয়ে কল কল করে একটানা সুরে বেজে উঠেছিল যেন। সুমুখের ছোট খালের ভিতর ভাঁটার টানে বিপুল বেগে জলরাশি ছুটে চলেছে, আশেপাশের নৌকাগুলি একটানে ভেসে যাচ্ছে, দেখতে মন্দ লাগছিল না। শিশির পড়ছে বেশ বোঝা গেল, তবু ফিরে আসতে আর ইচ্ছা করছিল না। জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র সৌন্দর্য্যের মাঝখানে বসে আমি একটা কল্পলোকের সৃষ্টি করে ফেলেছিলুম, যেখানে কোন দুঃখ, রোগ শোক নেই, শুধু চির-আনন্দ, এই রহস্যভরা মায়াজালের সৃষ্টির মাঝখানে আমরা যেন কোন অজ্ঞাত দেশের খোঁজে বেরিয়েছিলুম, এবং আমারই পাশে বসে আমার স্নেহময়ী ছোট বোনটির মনের গহন কোণে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, তা যেন আজ তার মিষ্টি, উদার, শান্ত মুখখানির ভিতর শত সহস্র রূপে ফুটে উঠেছিল। সরল মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বড় মায়া হল,—ভাবলুম, হায় হতভাগ্য অবিনাশ, নিজের ঘরে এমন সোনার প্রতিমা থাকতে তুমি কাঁচের আশায় জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াও। সে কি কোনদিন এ কথা বুঝতে পারবে না ?

রমলাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের আসল বাড়ী কোথায় ?

রমলা বললে, ফরিদপুরের কাছে কি একটা জেলা আছে না, তারই কাছে। গৌরনদীর নাম জানেন ?

আমি বললুম, কোথায় রে, ঢাকায় বুঝি।

রমলা হেসে বললে, আপনি ছেলেবেলায় ভূগোল পড়েন নি বুঝি ?

একটু অপ্রতিভ হয়ে মনে মনে ভাবলুম, গৌরনদী কোথায় এ

কথাটি জানি না বলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে, ঠিক বুঝতে পারলুম না। হয়ত আমার জানা উচিত ছিল।

নদীর ওপারে করুণ কণ্ঠে পাপিয়া থেকে থেকে ডেকে উঠছিল, লক্ষ্যার বুকে এমন সুন্দর দৃশ্য আর কোন দিন দেখিনি।

আসবার দিন রমলার চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা সদ্য অশ্রু দেখে এসেছিলুম, এমনি নীরব ব্যথার অশ্রু চিরদিনই কি তার আঁখির কোণে ফুটে থাকবে!

বছর খানেকের ভিতর আরো দু'একবার গিয়েছিলুম। শেষে বদলি হয়ে এলুম খুলনায়, মুর্শিদাবাদে, ডিব্রুগড়ে……কুমিল্লায় ……

তারপর পশ্চিমের একটা সহরে খোট্টার দেশে, মরুভূমির ধূ ধূ আগুন জ্বলে দিনের বেলা সেখানে। এলাহাবাদে ফিরে আসবার পথে একবার কোলকাতায় অবিনাশের খোঁজখবর করেছিলুম। দেখা হয়নি, শোনলুম, সে নাকি পুরী বেড়াতে গেছে, বাড়ীতে এক উড়ে ঠাকুর ছিল, তার কাছে শোনলাম, "বহুমা" সেই দেশের বাড়ীতেই আছেন।

• •

তিন চার বছর আর বাংলা দেশে আসতে পারিনি। যুদ্ধের ঘোরতর পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে ছুটি পাওয়ার বড় কড়াকড়ি আইনকানুন ছিল। আর দেশে আসবার জন্য তেমন একটা আকর্ষণও আমার ছিল না। সংসারে আমার বলতে তেমন কেউ নেই, এবং সংসার, সমাজের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। চাকরির অবসরে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার ফুরসৎ জীবনে হয়ে ওঠেনি, তাই নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে একটানা স্রোতে ভেসে চলেছিলুম কতদূরে,……ঠিক জানি না।

শুধু মাঝে মাঝে রমলার কচি কিশোর মুখখানি আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যেত, তার কথা মনে পড়ে আমার মনটা হঠাৎ বাংলাদেশের

তালগাছে ঘেরা আম-জাম সুপারি বনের ভিতর একখানি ন-গণ্য পল্লীর কথায় জেগে উঠত, সেই ঢেউ জাগা নদী, তীরে বনফুল, নীল অপরাজিতায় রঙে বাগান আলো হয়ে আছে। আর সেই রমলাদের ছোট মাঠের ধারে কি-এক রকম লাল ফুলের দোলনা ঝুলছে, তারই আগডালে ফিঙে নাচছে এবং ঝুলে ঝুলে দোল খাচ্ছে টুনটুনিরা। পাতাবাহারের ঝোপে ঝাড়ে রঙ্গিন প্রজাপতির মেলা, নীল আকাশের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজলা দীঘির অথই জলে শাপলা ফুলের ছড়াছড়ি, আর জ্যোৎস্না রাতে এমন তীব্র ফুলের গন্ধ ভেসে আসে যে, মনপ্রাণ নেশায় ভরপূর হয়ে থাকে।

দিন কয়েক কেমন জানি কি রকম লেগেছিল ঠিক মনে নেই, শেষে আর সহ্য করতে না পেরে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম বাংলাদেশের ক্ষুদ্র একখানি পল্লী গ্রামের উদ্দেশে। সে দিনও ছিল ঠিক ভাদ্রের ভরানদী। সারাদিন ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সন্ধ্যাবেলা একটু ধরে এসেছে যেন। কোন মতে কাদাভরা রাস্তায় পা বাঁচিয়ে সটান গিয়ে উঠলুম অন্ধকারে পোষ্ট অফিসের বারান্দায়। পোষ্টমাস্টার বাবু সেখানে ছিলেন না, খোঁজখবর করতে লাগলুম। আমার গলার স্বরে, কথা বলার ভঙ্গিতে বেহারী পিওন হুড়মুড় করে ছুটে এল, একেবারে পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বললে, ভিতরে এসে বসুন। আপনি থাকবেন বাইরে দাঁড়িয়ে, সে কেমন কথা, বলেই ভিজে লণ্ঠনটি এগিয়ে ধরে আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

দু' একটি কথা বলেই বেহারীকে জিজ্ঞেস করলুম, ও বাড়ীর সব কেমন আছে, বেহারী?

বেহারী ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে আর বলবেন না বাবু, বড় বিপদ আপদ গেছে তেনাদের, বুড়ো মা বেঁচে নেই, গেল বছর ঠিক এমনি দিনে বাবু, সে কি জল, কোন মতে তিন বুড়োতে—আমি,

ম্যানেজার বাবু আর সেই তিন পুরুষের বাজার সরকার তারিণী ঠাকুর,— তিনজনে মিলে শেষে শবদাহ করে আসি। গাঁয়ে কি লোক আছে বাবু! বাবুও এলেন না মরার সময়, টেলি দিলেন ম্যানেজার বাবু, কোন খোঁজখবর নেই। শেষে খবর এল শুনেছি শিলঙে নাকি বেড়াতে গিয়েছেন। কিন্তু হক্ কথা বল্‌ব বাবু, এমন সেবা করতে দেখিনি বৌমার মত, তিনি ত দেবী, ওঃ, যাবার দিন কি চোখের জলই না ফেলে গেছেন, যাওয়ার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। শেষে কি ভেবে চলে গেলেন বুঝতে পারলুম না।

কোনমতে ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় গেলেন ?

ফস্ করে বেহারীর মুখ থেকে বাহির হয়ে এল, তিনি ত জেলে বাবু।

—জেলে ? বলিস কিরে ?

—হাঁ বাবু, সত্যিই তিনি জেলে,······বেহারী সরকার বিশ বছর সরকারের নিমক খেয়েছে, মিথ্যা কথা কইতে জানে না। স্বদেশী করে না তেনার জেল হ'ল এক বছরের,······এখন বুঝি কলকাতায় না কই,······ ওই যে পোষ্টমাষ্টার বাবু আসছেন, তেনার কাছে সব জানতে পারবেন। আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ, সব কথা ভালো জানি না।

নূতন পোষ্টমাষ্টার বাবুর সাথে আলাপ পরিচয় হল। সব কথা শুনে নিলুম, কংগ্রেসের কি একটা আন্দোলনে যোগ দিয়ে রমলার এক বছরের জেল হয়েছিল, এখন সে আলিপুরের জেলে অনশন করছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। আরও শোনলাম, অবিনাশ নাকি আবার বিয়ে করেছে। দেশের জায়গা জমি সব ম্যানেজার বাবুই দেখেন শোনেন, শুধু টাকার দরকার হলে মাঝে মাঝে খবর আসে।

শেষ রাত্রিতে নৌকা ছেড়ে চলে এলুম। কোলকাতা গিয়ে যদি কোনমতে স্নেহের বোনটিকে বাঁচাতে পারি। জানি তার চোখের জলে

জগতের পাপপুণ্য সব লুপ্ত হয়ে গেছে, কত বড় দুঃখে সে যে দেশের সেবা মাথায় করে নিয়েছে, সে কি আমার আজ অজানা। মনে বড় দুঃখ হ'ল, কেন বছর খানেক আগে তার কোনও খোঁজ খবর করিনি। সে ত আমাকে দাদা বলেই জানত। অভিমানী ছোট বোনটির কথা মনে পড়ে নৌকায় শুয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম, কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলুম না। হয়ত এমনি চোখের জলে তার কতদিন কেটেছে কেউ তার খবর রাখেনি, আর কে-ই বা রাখবে। বাংলা দেশের বাপমায়েরা ত মেয়েদের বিয়ে দিয়েই কর্তব্য কাজ ইতি করে ফেলেন, ক্বচিৎ কেউ বা কালে ভদ্রে এক-আধটু খোঁজখবর করে থাকেন।

কলকাতায় পৌছে প্রথমেই তার খোঁজখবর করলুম। শেষে জানতে পারলুম রমলাকে নাকি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, এমনি তার গুরুতর অবস্থা। পাগলের মত ছুটে গেলুম তাকে দেখবার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখি জীর্ণশীর্ণ দেহখানি একেবারে রোগশয্যায় নেতিয়ে পড়েছে। ঢলঢলে দুর্গা প্রতিমার মত মুখ খানিতে সেই মিষ্টি হাসিটুকু যেন লেগেই আছে। আজ পনেরো দিন ধরে সে অনশন করছে। অথচ কোন মায়াবলে সে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা একেবারে ভুলে আছে,—সে মুখের কি অপূর্ব জ্যোতিঃ, একদৃষ্টে চেয়ে থাকা যায় না।

সুমুখে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রথমটা আমাকে চিনতে পারেনি ভালো করে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল সে। শেষে কোনমতে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললে, কে? দাদা! আর কিছু সে বলতে পারলে না। চোখ দুটি থেকে ক্রমাগত অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। চুপ করে বসে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগলুম। আশে পাশের নার্সরা এবং ডাক্তার সাহেব ফিস্‌ফিস্ করে আমার কানের কাছে বলতে লাগলেন, "ওকে বলুন, কিছু খাবেন নাকি? আজ না খেলে আর উপায় নেই।"

জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু খাবে ?

ফিক্ করে একটুখানি হেসে শীর্ণকণ্ঠে বললে, না দাদা, আপনি ফিরে যান।

এ অবস্থায় কোন রকম সান্ত্বনা দেওয়া উচিত হবে না ভেবে চুপ করে রইলুম।

অনন্ত পথের যাত্রীর জন্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু সকলের অলক্ষ্যে ঝরে পড়লো, সেই পরম পাথেয় বুকে করে রাজপথে বেরিয়ে এলুম। বালিগঞ্জের কাছে যখন এসেছি তখন শোনলুম, লোকজনেরা অনশন .ব্রতীদের সম্বন্ধে কি সব বলাবলি করছে। একজন বললে, অলকা সেন, রমলা দেবীর অবস্থা সাংঘাতিক। আর একজন বললেন, সন্ধ্যা চ্যাটার্জি, লীনা গুপ্ত, বিজলী সেন, স্মৃতি রায়, মীণাক্ষী দেবী, চিনু ঘোষের অবস্থাও নাকি ততোধিক······এই দেখুন খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

জানি রমলা চলেই যাবে, তাকে রাখবার মত কিছু নেই জগতে। বড় অভিমানে সে আজ চলে যাবে। এমন সুন্দর একটি প্রাণ হেলায় ফেলায় নষ্ট হয়ে গেল, ভগবান কেন তাকে এত রূপ গুণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

দশ বছর পরে আবার লেবঙে এসেছি। পথ ঘাট একটু বদলে গেছে বটে, কিন্তু রমলাদের বাড়ীর সম্মুখে এসে কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না যেন !

একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, প্রতুল বাবুরা এখন আর লেবঙে নেই, তারা কোলকাতায় না কোথায় আছেন, এ বাড়ী এখন ভাড়া খাটছে। রমলাদের বাড়ী অবধি একবার হেঁটে গেলুম। তাদের বাগান থেকে গোটা কয়েক তাজা ফুল রুমালে জড়িয়ে নিলুম। ফুলগুলি

কতদিন পরে শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল, সে খেয়াল আমার ছিল না। দূরে কোথায় ঝির ঝির করে একটা পাগলা-ঝোরার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর সেই সরল বনের একঘেয়ে সন্ সন্ শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসতেই পথের বাঁকে কতদিন তার সাথে দেখা হয়েছে, একে একে মনে পড়তে লাগলো।

সেই নীল শাড়ী পরা মমতা মাখা ছোট বোনটির সজল-চাওয়া মুখখানি মনের কোণে এক একবার ভেসে উঠে আবার ডুবে যাচ্ছিল……।

আর কখনও লেবঙে ফিরে যাইনি। লেবঙ পাহাড়ের স্বপ্ন-স্মৃতি আজ আমার কাছ থেকে দূরে……বহুদূরে·· ···চলে গেছে,……সে আর ফিরবার নয়………!

পরের ছেলে

সামান্য একটি ডুমুর গাছ লইয়া ছোট তরফে ও বড তরফে দস্তর মত মোকদ্দমা সুরু হইয়াছিল। কত টাকা পয়সা যে অযথা নষ্ট হইতেছে, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, রূপগঞ্জের ছোট তরফের জমিদার পান্নুবাবুরই এ বিষয়ে জিদ বেশী। তিনি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি না দেওয়ার পক্ষে বরাবরই ছিলেন, আর আজ একটা জলজ্যান্ত ডুমুর গাছ তাহারই চোখের উপর বড হিসার বড বাবুব আদেশে লোকজনেরা কাটিয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাহার নিতান্তই অসহ্য। পান্নুবাবু খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেণুবাবুব নামে আদালতে মামলা রুজু করিলেন। গ্রামের লোকেরা শুনিয়া ছি ছি করিল, কিন্তু পান্নুবাবু ইহাতে বিচলিত হইলেন না।

বংশ পরম্পরায় এই দুই পরিবারের মনোমালিন্যের ঘনঘটা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। প্রাচীনকালে কর্তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুটতরাজ, ফৌজদারী মামলা করিয়া জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, এ আমলে এখন আর এসব চলে না, দাঙ্গা হাঙ্গামার নামে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাই সামান্য খডকুটা লইয়া ঝগড়া-ঝাটি বাধে। পান্নু বাবুর জননী দাক্ষায়ণী এসব বিষয়ে পুত্রগণকে নিরন্তর উৎসাহিত করিতেন, বড় তরফের কর্ত্রী-মা এসব বিষয়ে বড একটা গ্রাহ্য করিতেন না। পুত্রবধূ কমলার উপর সংসারের সমস্ত ভার বুঝাইয়া দিয়া তিনি সারাদিন পূজা-সন্ধ্যায় দিন কাটাইতেন।

কমলা সাক্ষাৎ কমলার মত, কিন্তু নিঃসন্তান, তাহার মুখে হাসি না দেখিলে বাড়ীর দাসদাসী পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। ও বাড়ীর ছোট বউয়ের সাথে তাহার খুব ভাব। বাবুরা বিষয়-আশয় নিয়া ঝগড়াঝাটি করে, ইহাতে তাহাদের কি! প্রতিদিন খিড়কি পুকুরের পাশাপাশি বাঁধাঘাটে বসিয়া দুই জায়ে গল্প করিতে করিতে বিভোর হইয়া যায়, নাওয়া-খাওয়ার কথা তাহাদের আর জ্ঞান থাকে না। যখন অন্দর হইতে বার বার বড়-মার তাগিদ আসিতে থাকে, কমলা সাত তাড়াতাড়ি পুকুরে নামিয়া এক ডুবে স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

ছোট বউ সতী ঘরে ফিরিয়া গেলেই শাশুড়ীর যত রাগ হয় বৌয়ের উপর, অথচ মুখ ফুটিয়া কোন কথা ভালো বলিতেও পারেন না, গোমবা-মুখে বিড বিড করিয়া যা মুখে আসে তা-ই বলিতে থাকেন। মাঝে মাঝে বড় পৌত্রটির পিঠে মাথায় কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়া শাসনের স্বরে বলিয়া উঠেন, হারামজাদা ছেলে, আর একদিন গিয়ে দেখিস ও-বাড়ী। শত্রুর বাড়ী কখনও মানুষ যায়, কোনদিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে তোকে। আর একদিন যেয়ে দেখিস্ ও-বাড়ী, পা ভেঙে দেব না।

বারো বছরের ছেলে ফটিক ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিয়া বলে, কেন, গেলে কি হয়? ও-বাড়ীর বড়-মা আমাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে বলেছে, আমি, লাবু, হানু, টমপাই, আমরা একটা ক্লাব করবো জানো ঠাকুরমা! আমাদের বাড়ীর উঠানে আমরা খেলবো।

কথা শুনিয়া ঠাকুরমা বিকৃতস্বরে মুখ ঝামটা দিয়া উঠিলেন। ও পাড়ার ভুতো আসিয়া ডাক দিতেই ফটিক বাহিরে ছুটিয়া গেল। ঠাকুরাণী চেঁচাইয়া কহিলেন, আবার কোথা যাচ্ছিস রে? ও কেথার

মা, একবার দেখে আয় না বাছা, এই ঠাঁটা পোড়া রোদ্দুরে বের হয়ে যায় কোথা?

ক্ষেমার মা হাত পা নাড়িয়া কহিল, আর যাবে কোথা, হেই বড় বৌদির বাড়ী! সেখানে একদিন না গেলে ছেলের পেটের ভাত হজম হয় আবার! আমি যাবো এখন বাড়ী-বাড়ী ছেলে খুঁজতে! দাক্ষায়ণী বিরক্তির সুরে কহিলেন, তুই না পারিস, হরিকে একবার ডেকে দে না!

হরি গিয়াছিল বাজারে সরকার মশায়ের সাথে। ফটিককে আর পাওয়া গেল না। শিবপূজা করিতে করিতে দাক্ষায়ণী বার কয়েক ফুল বেলপাতা যেমন খুসী তেমনিভাবে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। যত রাগ হইল পুত্রবধূর উপর।

সেদিন দুপুরবেলা পানুবাবু খাইতে বসিলে দাক্ষায়ণী কাছে আসিয়া বসিলেন। একথা সেকথার পর তিনি ফটিকের বড়বাড়ী যাতায়াতের কথা বলিতে ভুলিলেন না। পানুবাবু গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, কোন মতে আহারাদি শেষ করিয়া জীববিশেষের মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, কোথা সেই হতভাগা, ডাকো দেখি এখানে।

ফটিকের ছোট বোন বুড়ী সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, চুপিচুপি বাবার কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, দাদা লিচুগাছের আগডালে বসে বাদুড় ঝুলছে।

দাক্ষায়ণী সায় দিয়া কহিলেন, ওইত ওর কাজ, ছাই, রজনীমাষ্টার ওকে পড়ায় কিছু? তার চেয়ে মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিলেই হয়। এদিকে সারাদিন, আর সন্ধ্যা অবধি পড়াবে রজনী মাষ্টার, দেখি কি করে যায়।

বুড়ী ছুটিয়া গিয়া দাদার কাছে খবর দিতেই সে একলাফে নীচে

নামিয়া বড়বাড়ীর খিড়কি দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে কমলার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল, বড-মা!

কমলা ধীরে ধীরে তাহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কি হয়েছেরে ফটিক? অমনি ছুটে এলি কেন, কি হয়েছে বল না?

ফটিক দুষ্টুমির একটুখানি হাসি হাসিয়া কহিল, বাবা নাকি আমাকে মারবে।

—কেনরে!

—তোমার কাছে যখন-তখন আসি বলে। ঠামা বলে দিয়েছে বাবার কাছে। আচ্ছা বড়-মা, তোমাদের বাড়ী এলে কি দোষ হয়।

কমলার আসল ব্যাপার বুঝিতে বিন্দুমাত্র দেরী হইল না। সব কথা সে জানে, বোঝে, কিন্তু কোন কথায় সে যায় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না, দোষ হয় না। এই কথাটি বলিয়াই পরক্ষণে ফটিককে ভুলাইবার জন্য কহিল, আজ ইস্কুলে গিয়েছিলি?

ফটিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। জানো বড়-মা, আজ মাষ্টার মশায় বুড়ীর কান দুটি মলে দিয়েছে, পড়া বলতে পারেনি, বলিয়াই ফটিক অঙ্গভঙ্গী সহকারে রজনী মাষ্টারের মুখবিকৃতি অভিনয় করিয়া পুনরায় কহিল, ঠা'মা বলেছে আমাকে বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে।

সব কথা শুনিতে শুনিতে কমলা অন্যমনস্কের মত কহিল, বেশত।

কিন্তু তাহার মনে ফটিকের এ বাড়ী আসা-যাওয়া সম্বন্ধে নানা কথা জাগিতেছিল। দুই তরফে ঝগড়াঝাটি, মামলা মোকদ্দমা হয় সত্য, তাই বলিয়া ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করিতে পারিবে না, এ কি ধরণের কথা সে ভালো বুঝিতে পারিল না।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে ছোট বাড়ীতে বিষম কোলাহল, চীৎকার শুনিয়া কমলা চিলে ছাদের কাছে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি দেখিল,

ফটিককে তাহার বাবা পান্নুবাবু রীতিমত মার-ধর করিতেছিলেন। এ দৃশ্য যে আজ নূতন নয়, ইহা কমলার বেশ ভালো জানা ছিল। ফটিকের মা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সে বোবার মত চুপ করিয়া রহিল। অথচ স্বামী তাহার কথায় উঠে, বসে, এই কথা বার বার মনে করিয়া কমলার দরাজ প্রাণটি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। কমলা জানে, ফটিক তাহার গর্ভজাত সন্তান নয়, ভগবান তাহাকে এবিষয়ে চিরদিনের মত বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ ত তাহার আছে, সে জানে সন্তানের ব্যথা বেদনা।

দাক্ষায়ণী আনন্দে ডগমগ হইয়া পুত্রের সুমুখেই শাসনের সুরে কহিতে লাগিলেন, কেমন, এবার হয়েছে, আর একদিন যেয়ো, পিঠের হাড় মাস আর আস্ত থাকবে না। ফটিক মড়ার মত চুপ করিয়া রহিল, একটি কথা তাহার মুখ হইতে আর বাহির হইল না। তাহার বড়ো করিয়া মনে পড়িল তাহার জননীর কথা, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আজ কেহ তাহার গায়ে হাত তুলিতে আবার সাহস করিত। ছ'বছরের সময় তাহার জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, বৎসর না ঘুরিতেই তাহার নূতন-মা আসিয়া এবাড়ীতে উপস্থিত হয়। সকল কথাই তাহার বেশ মনে পড়ে।

তাহার ছোট ভাই টিটু ও মেজ বোন বুড়ী শত সহস্র অন্যায় করিলেও তাহাদের সাত খুন মাপ, আর তাহার বেলায়ই যত দোষ নন্দ ঘোষ।

বিষম মার খাইয়া বেচারী ফটিক বিছানায় পড়িয়া রহিল, বিন্দু ঝি, ক্ষেমীর মা, রসিক ঠাকুর তাহাকে শত সাধ্য সাধনা করিয়াও খাওয়াইতে পারিল না।

একথা কমলার কাণে গেল। কমলা বড়ঘরের মেয়ে, সতীর মত

গরীবের ঘরের মেয়ে নয় সে; বাপের বাড়ীর দাসী পটলকে ডাকিয়া কহিল, ফটিক কি এখনও না খেয়ে শুয়ে আছে পটল? একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌ এখানে, যা না একবার?

পটল জিভ কাটিয়া কহিল, তা'হলে আর কারও রক্ষা থাক্‌বে, বিন্দুকে জিজ্ঞেস করে তবে ত এই খবর নিয়ে এলুম। আমাদের ও-বাড়ীতে যাওয়া নিষেধ দিদিমণি। আমি আর কামিনী ঝি। বামুন দিদি যায়, সে আলাদা কথা।

কমলা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, শশী, গোরা ওরা যায় ত?

—তা কি করে বল্‌ব দিদিমণি! রেখে দাও ওসব কথা, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ কেন! একটি ছেলে ত পেটে ধরনি। ভগবান দেননি কি করবে বলো!

কমলার চোখ মুখ রাগে, দুঃখে ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কোন মতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, কি বললি লা, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা, তোকে আমি কোন কথা জিজ্ঞেস করেছি, যা এখান থেকে, দূর হয়ে যা।

পটল ধমক খাইয়া চলিয়া গেল, রান্নাঘরের পিছনে আসিয়া কামিনী ঝিকে একা দেখিতে পাইয়া কহিল, আচ্ছা, তুই বল না কামিনী, আমাকে বলে কিনা ফটিকে-কে ডেকে নিয়ে আয়, তুই পারিস্‌ কামিনী!

কামিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেন পারবো না, যার খাই তার পরি, তার নামে দিই গড়াগড়ি, হাজার বার পারবো। ও বাড়ীর ছোট-মা আমাকে একটু ভালো চোখে দেখেন, কত ফুট ফরমাস করে দিই তার যখন-তখন, আর এ সামান্য কাজ পারব না।

পটল মুখ ভার করিয়া কহিল, ওসব রাজ-রাজড়ার কাণ্ড কারখানা

আমি ভালো বুঝিনে কামিনী, তোর যা খুসী, তুই কর্গে, বলিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কামিনী ঝি মুখে যতই বলুক না কেন, কাজের বেলায় কিছুই করিতে পারিল না। সে রাত্রিতে কমলা জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না, তাহার তৃষিত মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা শুধু অন্তর্যামী জানিলেন।

ভোর না হইতেই ফটিক আসিয়া হাজির। কমলা ধড়মড়িয়া জাগিয়া বসিল। বেণুবাবু ফটিককে সুমুখে দেখিয়া কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। তাহার মুখে কি একটা কথা সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল। হরিপুরের প্রজাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তিনি সেরেস্তার দিকে চলিয়া গেলেন।

কমলা মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কেন এসেছিস ফটিক, আমার জন্য তোকে কম শাস্তি পেতে হয়, তুই আর আসিস্‌নে ফটিক। শেষের কথা কয়টি বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিয়াছিল। উদ্‌গত অশ্রু কোন রকমে দমন করিয়া কমলা কবাটের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলার মনে পড়িল, ফটিকের এই ব্যাপার নিয়া কাল এ বাড়ীতেও একটা কুরুক্ষেত্র হইয়া গেছে। বেণুবাবু খুব ভালো লোক, হঠাৎ রাগিলে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কাল নাকি তিনি কমলাকে যা মুখে আসে তাই বলিয়াছেন। স্বামীর মুখে এমন রূঢ় বাক্য সে সচরাচর বড় একটা শোনে নাই। তাই কমলার শুধু অভিমান হয় নাই, একটু বেশ মনে দুঃখও হইয়াছে। স্বামী বারংবার খোঁটা দিয়াছেন, পরের ছেলের জন্য তার অত মাথা ব্যথা কেন! পরের ছেলে, একথা ভাবিতেও তাহার বুকখানি হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠে।

ফটিকের এখন একটু বয়স হইয়াছে, সে এসব কথা যে না বোঝে

এমন নয় ; কমলাকে সে কি চোখে দেখে, তাহা সে নিজেও ভালো জানে না। সাত বছর বয়সে ফটিক জননীকে হারাইয়া এই কমলার কাছে সময়ে অসময়ে অন্যায় আবদার করিত। দুই তরফে যখন মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত ছিল না, কমলা হাসিমুখে এবাড়ীতে আসা যাওয়া করিত, এবাড়ীর মেয়েরা কদাচিৎ বড় বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিত, কিন্তু ছেলেপেলেদের বেলায় এসব কথা কেহ কোনদিন কোন-কিছু কানে শোনেনি !

ছলছল চোখে চাহিয়া ফটিক ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। এক মাসের ভিতর সে আর এবাড়ীতে পা দেয় নাই। বাবা মাও এখন আর তাহাকে তেমন বিষচক্ষে দেখেন না। তবে যার মা নাই, সংসারে বাপের সঙ্গে তার এমন কি সম্পর্ক থাকিতে পারে। সতী তার নিজের ছেলেমেয়ে নিয়াই ব্যস্ত, ফটিকের কথা বড় একটা কাহারও এ বাড়ীতে মনে পড়ে না। সে খায় কি না খায়, বাঁচে কি মরে, পরের ছেলের জন্য এত দরদ আবার কারো থাকিতে পারে।

বামুন-দিদি এই মা-মরা ছেলেটিকে একটু স্নেহের চোখে দেখিতেন, পটলের তাহা সহ্য হইত না, সে টিটু, বুড়ীকে কাছে পাইলে হাতে আকাশ পাইত, অন্ততঃ এই ভাবটাই সতীর কাছে দেখাইত।

সেদিন বামুনদিদি বড় একটা কই মাছ ভাজা টিটুর পাতে না ফেলিয়া স্নেহভরে ফটিকের থালায় দিয়াছিল। পটলের চোখে তাহা এড়ায় নাই কিন্তু। সে তখনই ছোট মায়ের কানে নানা কথায় রঞ্জিত করিয়া কথাটি তুলিয়া আসিল। সহসা রান্নাঘরে সতীর আবির্ভাবে বামুন-মেয়ের ধড়ে আর প্রাণ ছিল না। টিটু মাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, কই মাছ ভাজা কই ? আমাকে একখানা দিতে বল না। দাদাকে কেন দিয়েছে ?

ফটিক মুখ গুঁজিয়া ভাত খাইতেছিল, টিটুর দিকে চাহিয়া কহিল, আমি দেব আধখানা, এই নাও।

যেমন বলা, সতী রান্নাঘর কাঁপাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ওকি তোমার খায় না পরে, হ্যাগা বামুন মেয়ে, তোমার চোখে একটুখানি পরদা নেই নাকি! আমার ছেলে হ'ল পর, আর পরের ছেলে হ'ল আপন, কি একচোখো তুমি বাছা!

বামুন মেয়ে ধীরে ধীরে কহিল, কাল ছোটকে দিয়েছি, আজ ফটিককে দিয়েছি।

দাক্ষায়ণী পাশের ঘর হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, শেষের কথা কয়টি তাহার কানে যাইতেই তিনি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রান্নাঘরের দাবায় আসিয়া পৌছিলেন, কহিলেন, ছোটকে কাল দিয়েছ বলে আজ আর দেওয়া যায় না। আমি সব বুঝি, সব জানি। লুকিয়ে লুকিয়ে সব ভালো জিনিষ খাওয়ানো হয় ওই হাড়হাবাতে পোড়ারমুখোকে। বলি বামুন মেয়ে, কার খাও, কার পরো; সে কথা কি তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাতে হবে নাকি!

বামুনদিদি ও যে-সে মেয়ে নয়, রাগতভাবে বিরক্তির স্বরে কহিলেন, তা আর জানিনে! কার খাই, কার পরি বেশ জানি! মা লক্ষ্মী স্বর্গে গেছেন, ওইত একটিমাত্র ছেলে, পরের ছেলেকে গাঁশুদ্ধ লোকে জানে, খেতে বসে একটি কথা পর্য্যন্ত নেই, যা দাও তাই খেয়ে উঠে যায়, মুখে রা শব্দটি নেই। ওর যদি না এমনি ভাবে কপাল পুড়বে তা'হলে একটুকরো মাছের জন্য এত কথা শুনতে হয় আমাকে!

ফটিকও ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অবাক, সে তাড়াতাড়ি মুখের ভাত ফেলিয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া পড়িয়া পুকুরের দিকে মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। দাক্ষায়ণী হাড়ে-হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, কি গো

নবাব পুত্তুর, এক থাল ভাত যে ফেলে উঠে গেলে, তোমার কোন জমিদারী থেকে টাকা আসে শুনি !

খিড়কি পুকুরে স্নান করিতে গিয়া কমলা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল, ফটিক ঘাটে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়া ক্রমাগত উদ্গত অশ্রু দুই হাতের মুঠোয় ঠেলিয়া রাখিতেছিল। হঠাৎ কমলার চোখাচোখি হইতেই ফটিক তাড়াতাড়ি ঘাট ছাড়িয়া বাগানের পথে কোথায় জানি অদৃশ্য হইয়া গেল !

আজ আবার কি ব্যাপার, ভাবিয়া কমলা ধীরে ধীরে বাঁধা ঘাটের রোয়াকে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। আজ প্রায় তিন মাস পরে এই একদিন দেখা। বড়-মাকে এড়াইয়া চলিবার কৌশল ইতিমধ্যে ফটিক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। পুকুর ঘাটে স্নান করিতে গেলে সে বুড়ীকে কাঁচা পাকা পেয়ারার লোভ দেখাইয়া বসাইয়া রাখে। বড়-মার সাড়া শব্দ পাইলেই বুড়ী চোখ ইসারায় সে কথা ফটিককে জানাইয়া দেয়। সেও ঝুপ করিয়া এক ডুব মারিয়া ভিজা কাপড়ে ভিতরে ছুটিয়া আসে।

ডুমুর গাছ লইয়া যখন মন কষাকষি চলিয়াছিল, তখন শুধু কমলা বিজয়া দশমীর দিন একবার এ বাড়ীতে পা দিয়াছিল, সতী, পানু ও ছেলেপেলেরা বড় বাড়ীতে আসিয়া দেখা শোনা করিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া এ বাড়ীর কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত ভুলে ও বাড়ীর আঙিনায় ছুটিয়া যায় না !

কালে ভদ্রে সতীর সাথে কমলার পুকুর ঘাটে দেখাশোনা। ফটিকের মারধরের ব্যাপারের পর হইতে কথাবার্ত্তা বড় একটা হয় না। ছোট বউ বড় বউকে দেখিলে ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যায়, বড় বউ দেওরকে স্মুখে দেখিতে পাইলে কনে বৌয়ের মত চলাফেরা করে। এইভাবে

দিন চলিয়াছে। বড় বাড়ীর কর্ত্রীমাকে কেহ বড একটা দেখিতে পায় না। ইদানীং তিনি গয়া কাশী করিতে বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন। যাওয়ার সময় সকলের সাথে দেখাশোনা করিয়া গিয়াছেন, কবে পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ছ'মাসও হইতে পারে, আবার দু'মাসেও ফিরিয়া আসিতে পারেন।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারে কাজকর্ম্মের অন্ত নাই। মুখুয্যে বাড়ীর শৈলরা বড় বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কথায় কথায় কহিল, ছোট বাড়ীর পানুবাবুর ছেলে ফটিক এবার পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে।

কমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, পোড়ারমুখো ছেলে সে কথা একবার বলেছে এসে। দেখা হলেই ছুটে পালায়।

শৈল ফস্ করিয়া তাহার মুখের উপর জবাব দিল, ছুটে পালাবে না ত কি! বাপ মায়ের শিক্ষা, আর ওই বুড়ী যত নষ্টের গোড়া। ছেলেমেয়ের মাথা খেলে ওই ডাইনি! ওই ডাইনি বুড়ী ও ফটিককে এখন দু চোখে দেখ্‌তে পারে না!

কমলা সে কথায় কান না দিয়া কহিল, থাক্, সুখে বেঁচে থাক! পড়াশোনায় ভালো না হলে ওর উপায় আছে!

কাদম্বিনী জিহ্বা উল্‌টাইয়া মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করিয়া কহিলেন, মা মরলে বাপ হয় তালুই। ছেলেটার কি দুর্গতি গো। দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় না! তার ওপর মারধর বকাঝকা ত আছেই। কিন্তু কি লক্ষ্মী ছেলে, কি বলব বৌমা, এমনটি হয় না। দুর্গার পেটে সোনার ছেলেই এসেছিল। ওই নাম করেই ত তার প্রাণ বেরিয়ে গেল! আহা পরের ছেলেকেও লোকে কত আদর যত্ন করে, আর এত···

কমলার চোখ দুটি সহসা সজল হইয়া উঠিল, কহিল, ঠাকুরঝি, একবার দেখা হলে আস্‌তে বলো না! আগে আস্‌ত ভাই, এখন আর আসে না!

শৈল মুখ ভার করিয়া কহিল, আমাদের নিখিল সেদিন বলছিল, ওর বাবাই নাকি কোথাও যেতে মানা করে দিয়েছে। তাই বোধ হয় আসে না। তা' বলে তোমাদের বাড়ী আস্‌বে না, সে কি কথা! তুমি হলে আপন জ্যেঠাই মা! পাশাপাশি বাড়ী, এক দাদামশায়ের ছেলে পানু আর বেণু! ঝগড়াঝাটি মামলা মোকদ্দমা হাজার হয় একখানে থাকতে গেলে, তা' বলে ছেলেমেয়েরাও ঝগড়া করে এ বাড়ী আস্‌বে না নাকি, একি একটা কথার কথা হ'ল। আর শুনলে লোকেই বা তোমাদের কি বলবে বলো!

কমলা চুপ করিয়া রহিল, আর কোন কথা বলিল না!

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শৈল কহিল, আমাদের মনু কাল কি বলছিল জানো বৌদি! ফটিক এবার জলপানি পেয়েছে না! সেই টাকা মাসে মাসে জমা করে তোমার টাকা নাকি শোধ করে দেবে। বলে কি আবার জানো, বড় মা আমাকে জলখাবারের জন্য অনেক পয়সা দিয়েছেন, তাই সেদিনও গিয়েছিলাম পয়সা চাইতে, তাড়িয়ে দিয়েছে।

কমলা এক মুহূর্ত্তে মুখখানি কালি করিয়া কহিল, শোন, ছেলের কথা, আমি কখন তাকে তাড়িয়ে দিলুম? আচ্ছা ঠাকুরঝি, মনুকে একবার আস্‌তে বলো না কাল, সব কথা শুনব। উপস্থিত মেয়েরা 'ও একটা বাজে কথা, ও সব কথায় কান দিয়ো না বড় বউ—' প্রভৃতি মন্তব্য করিয়া যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হয়—হয় প্রায়। কমলার কত কথাই আজ মনে পড়িতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে ছাদের ওপর দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে

নদীর পথের দিকে চুপি চুপি চাহিয়া থাকিত। ছেলের দল হল্লা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যায়, ফটিকও তাহাদের সাথে খেলা করিতে আসিত। যদি ভুলে কোনদিন সোনার ছেলে এদিক পানে একবার ফিরিয়া চায়! কতদিন মুখুয্যেদের মনুর কাছে, ও পাড়ার হারুর কাছে কমলা বলিয়া দিয়াছে ফটিককে আসিবার জন্য, ফটিক আর আসে না। তাহাকে শত ডাকাডাকি করিলেও সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

মহাষ্টমী পূজার দিন রাত্রিতে গ্রামের মেয়েরা প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কমলাও গিয়াছিল। তাহার সাধারণ কাপড় জামা দেখিয়া গ্রামের মেয়েরা অবাক হইয়া গেল। এ বাড়ী ওবাড়ী করিয়া তাহারা ঘোষালদের বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছিল। সেখানে আজ আবার যাত্রা গান হইবে। ছেলের দল সন্ধ্যা হইতেই ভিড় করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছিল। ফটিক এক কোণে একটা ময়লা জামা পরিয়া চুপ করিয়া কি জানি দেখিতেছিল। ঘোষালদের হেবো তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, কিরে ফটিক, তোর বাবা তোকে একটা নূতন জামা কিনে দিতে পারে নি? তোরা দেখি বড়লোক, জমিদার। দেখ্‌ত, আমার বাবা কেমন সুন্দর জামা, কাপড়, জুতা কিনে দিয়েছেন! তোর লজ্জা করে না, ময়লা জামা পরে এসেছিস্ যে এখানে!

ফটিক তর্ক না করিয়া কহিল, বাবা বলেছেন, কাল কিনে দেবেন!

—ওঃ পূজোর পরে। কালী পূজার সময় নাকি? হেবো হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল!

কমলার কানে সব কথা গিয়াছিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া চাহিয়া দেখিল, আশে পাশে আর কেহ সে সব কথা শুনিতেছে কিনা।

বিরাট প্রাঙ্গণে আরতির ধূপের ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া

গেছে। দিগম্বর ঢুলী বাব্‌রি চুলের গোছা নাড়াইয়া তালে তালে ঢাক বাজাইয়া নাচিতেছিল। গণেশ মুখোটি হুঁকা হাতে খড়ম পায়ে মাথা নাড়িয়া তাল ঠুকিতেছেন দেখিয়া হারাণ ঘোষাল হাসিয়া কহিলেন, কি পুতি, কেমন ঢাক বাজায় দিগু! চমৎকার হাত বল্‌তে হয়। বাগ্দীপাড়ার দুইটি ছেলে কানাই ও ফেলু ধুনচি মাথায় করিয়া নাচিতে নাচিতে সারা বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

ফটিক তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল, এবং আরতির পর যাত্রা গান শুনিয়া বাড়ী ফিরিবে ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেই সে ফিরিয়া দেখিল, সুমুখে বড়-মা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ফটিক চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না, কমলা কহিল, কিরে এত রাগ করেছিস্ কেন? চল আমার সঙ্গে, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌বি। ভোলা চল, আমরা এখন যাবো!

রমা সোৎসাহে কহিল, আরতি দেখ্‌বে না বৌদি?

কমলা হাসিমুখে কহিল, এইত দেখলুম। এখন যাই, কাল সময় হয়ত আর একবার আস্‌বো!

পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা যাত্রাগানের আশায় আসিয়াছিলেন, তাহাদের আর যাওয়া হইল না।

পথে পড়িয়া কমলা কহিল, হ্যাঁরে ফটিক, তোকে যে কতদিন আমি আস্‌তে বলেছি, আসিস্ নি কেন রে?

—মা বারণ করেছে।

কামিনী ঝি সায় দিয়া কহিল, সত্যি মা সত্যি তাই। যখন তখন তেনারে ধরে মারপিট করেন।

কমলা মনে মনে ভয় পাইয়া কহিল, তুই নিজে দেখেছিস্?

কামিনী ঝি হাত পা নাড়িয়া চোখ বড়ো করিয়া কহিল, দেখিনি আবার, সেদিন বুড়ীর সাথে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, সেই নিয়ে সে কি মার দিলে মা, বলনা ভোলা, তুইত সেদিন দাঁড়িয়ে দেখছিলি সব!

ভোলা সাথে সাথেই বলিয়া উঠিল, সত্যি মা সত্যিই তা, বুড়ীকেও খুব মেরেছিল।

শুনিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল। বাড়ী পৌছিয়া কমলা কহিল, আজ কি খেয়েছিস্?

ফটিক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, হেবোদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়েছি।

—আজ এখানে খাবি, কেমন?

ফটিক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, খাবো না!

—কেনরে?

—তুমি যে মানা করেছ, আর কোন দিন আস্তে না……

কমলা তাহাকে বুকের মাঝে জড়াইয়া কহিল, ওরে বোকা ছেলে, মা কখনও ছেলেকে আস্তে মানা করে! সেদিন অমনিই বলেছিলাম। আর কোন দিন বল্‌ব না!

ফটিক আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া মেজের উপর একখানি আসনে বসিয়া পড়িল, একখানি রেকাবিতে আহার্য্য, ফলমূল, গৃহজাত সন্দেশ, নারিকেলের নাড়ু, মোঁয়া, চিরা-জিরা, গঙ্গাজলী সব পরিপাটিরূপে সাজাইয়া বহুদিন পরে আজ আবার কমলা ছেলেকে খাওয়াইতে সুমুখে বসিয়াছিল।

ফটিক প্রথমে কিছুই খাইতে পারিবে না, এই মাত্র পেট ভরিয়া খাইয়া আসিয়াছে এই সব কথায় তাহার কাছে কাকুতি মিনতির আবেদন জানাইতেছিল, কিন্তু আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, বড়মার সাথে গল্পে-গল্পে অন্যমনস্ক হইয়া সে পরম তৃপ্তি সহকারে সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রি দশটায় যখন ফটিক গৃহে ফিরিয়া আসিল, কমলা বারবার

মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়াছিল, কাল ঘুম হইতে উঠিয়াই যেন এখানে সে চলিয়া আসে। বাজারে মনমোহন বাবুর দোকান হইতে বড় মা জামা-কাপড সব কিনিয়া দিবে।

সারারাত্রি ফটিক ভালো ঘুমাইল কি ঘুমাইল না,—তাহা ভালো বোঝা গেল না। বাহিরে কোন রকমে একটুখানি আলোর আভাস চোখে পড়িলেই এবং পাখীদের ডানাঝাড়ার শব্দ শুনিয়া সে কাঁচা ঘুমে বারকয়েক জাগিয়া বসিযাছিল। এবং কাল সকালবেলা নূতন জামা কাপড় পরিয়া সে হেবোকে নিশ্চয়ই একবার দেখাইযা আসিবে যে তাহার কথা ঠিক কিনা!

নবমী পূজার সময় খুব অল্প ছিল বলিয়া মাখম পুরোহিত রাত্রি ভোর না হইতেই বিষম চেঁচামেচি স্থরু করিয়া দিতেই ছেলের দল ফুল সংগ্রহের জন্য এ-বাড়ী সে বাড়ী ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

হরিধনদের বাড়ী নীল অপরাজিতা আছে, টিটুর তাহা জানা ছিল, সে ঘোষালদের পুকুর পাড় হইতে সব কয়টি রাঙা জবা, শেফালি, ভাঁট ফুল, যাহা সে হাতের কাছে পাইয়াছিল, সব কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছে। হেবোদের বাগানে একটি স্থলপদ্মও নাই, ফটিক আগডালে চডিয়া সব সাবাড় করিয়া দিয়াছিল। বড়-মাদের ভোলা একটি ফুলও পায় নাই, ফটিক তাহাকে এক সাজি ফুল দিয়া গেল। টিটু সে কথা বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে বলিতে ভোলে নাই, অমনি ফটিকের খোঁজ খবর হইল।

ফটিক তখন বড়-মাদের বাড়ী বসিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া এক ডালা মুড়ি সন্দেশ সহকারে চিবাইতেছিল, ব্রজেন্দ্র সরকারকে বড়-মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন এক্ষুনি বাজারে যাইতে হইবে এবং জামা কাপড় সব কিনিয়া আনিতে হইবে।

মাখম পুরোহিত পাঠা উৎসর্গের জন্য বিষম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে বড়-মা ভিতরে বসিয়া ব্রজেন্দ্রের অপেক্ষা করিতেছে, ছেলেকে জামা কাপড় না পরাইয়া তিনি কিরূপে নিজে সাজিয়া গুঁজিয়া পূজা দেখিতে যাইবেন।

এমন সময় কামিনী ঝি আসিয়া খবর দিল, ব্রজেন্দ্র জিনিষপত্র নিয়া আসিতেছে। ছোট বাড়ীর টিটু, তাহার ছোট বোন বুড়ী বড়দা'র খোঁজে এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া খুঁজিয়া মরিতেছিল। হঠাৎ বড় বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বড়দা'কে সিল্কের জামা, কোট, কাপড় পরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি দাদার কাছে ছুটিয়া আসিল এবং বড়দা'র হাতে ধরিয়া টানিয়া কহিল, জ্যেঠাইমা দিয়েছে বুঝি!

ফটিক ফিরিয়া চাহিল, কহিল, জ্যেঠাইমা তোদের ও দেবে বলেছে।

বুড়ী আনন্দে নাচিতে নাচিতে সে কথা মায়ের কর্ণগোচর করিতে ছুটিয়া গেল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে মায়ের কাছে কোন মতে পৌছিয়া বুড়ী কহিতে লাগিল, জানো মা, জ্যেঠাইমা আমাদের নূতন জামা কাপড় কিনে দেবেন, দাদাকে কত ভালো ভালো জামা কাপড় দিয়েছে।

বুড়ীর মা সে কথা শুনিয়া হিংসায়, ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া এই পূজা পার্ব্বণের দিনে মেয়েকে ঘা কয়েক বসাইয়া দিলেন। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, বিন্দু ঝি, শীগ্‌গীর শুনে যা?

বিন্দু ঝি নীচে কাজ করিতেছিল। ডরে, ভয়ে নবমীপূজার সদ্যস্নাতঃ জীব বিশেষের মত কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, কি দিদিমণি?

সতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, বড় বাড়ী থেকে ফটিককে ধরে নিয়ে আয় ত। না আসে জোর করে নিয়ে আস্‌বি, গোরাকে সঙ্গে নিয়ে যা! আর তার গায়ে যত জামা কাপড় দেখবি না, সব ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আস্‌বি, বুঝলি? যাঃ!

ফটিক তখন দাঁড়াইয়া পাঠাবলি দেখিতেছিল। বিন্দু ঝি ফিসফিস্ করিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া কহিল, শীগ্‌গীর চলো, মা ডেকেছেন আর এই সব জামা কাপড় ভিতরে রেখে এস, নইলে আর রক্ষা থাক্‌বে না। ছোট-মা সব শুনেছেন!

ফটিক রাগত ভাবে কহিল, শুনেছেন ত বড বয়ে গেছে আমার! যা, আমি যাবোনা!

বিন্দু ঝি জিভ কাটিয়া কহিল, ও কথা বল্‌তে নেই খোকাবাবু। কর্ত্তা শুনলে আর তোমাকে আস্ত রাখবেন না। ভালো চাও ত এখন বাড়ী চলো।

—আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না, একশ বার ত বলছি। আমাকে কেটে ফেল্‌লে ও যাবো না। আমি বড়-মার কাছে থাক্‌ব। বড়-মা বলেছেন এখানে থাক্‌তে।

সে কি হয় খোকাবাবু. এখনও চলো, ভালো বলছি, বিন্দু ঝি অনেক রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। ফটিক তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল! এক উঠান লোক বিন্দু ঝির সে দৃশ্য দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিন্দু ঝি বিষম ব্যথা পাইয়াছিল, কোনমতে চোট সামলাইয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটা গোলমাল শুনিয়া কমলা ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল। গোরার মুখে সব কথা শুনিয়া সে একেবারে থ' খাইয়া গেল, কিন্তু ফটিককে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া গোরাকে চুপি চুপি বলিয়া দিল, গোরা, তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিকেলে পাঠিয়ে দেব অখন! ছেলে মানুষ, ওর কি অত বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে! হ্যাঁরে ভোলা, বিন্দুর কি খুব লেগেছে?

ভোলা মুখখানি নীচু করিয়া কহিল, না মা, তেমন লাগেনি। তবে সিঁড়ির উপর পড়ে গেলে মাথা ফেটে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হ'ত!

কমলা আর কোন জবাব দিলনা, ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ফটিককে সাথে লইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিজয়ার দিন ভোলা আসিয়া খবর দিল, মা দাদাবাবুকে আজও পাওয়া যায় নি। তিনি সেই যে সেদিন এ গাঁ ছেড়ে চলে গেছেন, আর আস্‌বেন না নাকি বলে গেছেন! বাঘা জেলের সাথে সমস্তিপুরের পথে দেখা হয়েছিল!

কমলা হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, তা হলে কোথায় গেল! আর সমস্তিপুরের পথেই বা কোথায় যাবে?

—তা' কি করে বল্‌ব মা, বলিয়াই ভোলা ধীরে নীচে নামিয়া গেল। প্রতিদিন কমলা ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভাবে—আজ ফটিক নিশ্চয়ই আসিবে। বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া দুপুর হইয়া যায়, কমলার স্নানাহারের হুঁস থাকেনা। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে!

ফটিকের কোন খোঁজ খবর নাই!

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি কমলা ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িল, গ্রামে তখন জ্বরের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী! নিশি কবিরাজ কত ওষুধপত্র দিতেছে, কিছুতেই কিছু হইতেছেনা। এদিকে সেই ডুমুর গাছের মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। সীমানা লইয়া দুই তরফে প্রবল মনোমালিন্য, রেষারেষি চলিয়াছে, এখন পান হইতে চুণ খসিলেই আর একটা মোকদ্দমার সূচনা হয়।

পানুবাবুর বিশ্বাস, কমলার পরামর্শ মতই ফটিক রূপগঞ্জের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কমলা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

দিনকয়েক পরে খবর আসিল, ফটিক তাহার মামা বাড়ীতে সুখে আছে, মামারা সকল কথা জানিয়া শুনিয়া ফটিককে আর রূপগঞ্জে পাঠাইতে চাহে নাই।

বড়মার কথা ফটিকের এখনও মনে পড়ে। সে প্রত্যেক শনিবার দিন ডেম্‌রার গঞ্জে ঘোরাফিরা করে, সেখানে তাহাদের গাঁয়ের বেপারীরা প্রায়ই হাট-বাজার করিতে আসে, তাহাদের সাথে দেখা হইলেই ফটিক গাঁয়ের খবর জানিয়া লয়, বড়মার কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও ভোলে না। কিন্তু আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কি জানে! বড়-মার কথা কেহ তত ভালো বলিতে পারে না।

একদিন তাহাদেরই ভিটে বাড়ীর প্রজা রামসুন্দরের কাছে সে শুনিয়া ফেলিল যে বড়মার নাকি খুব অসুখ। সেই দিন অবধি ফটিক শুধু মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত! রূপগঞ্জে আর ফিরিয়া যাওয়ার কোন উপায় নাই। বাবা, মা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, ও বাড়ীর জ্যেঠামশায় হয়ত লাঠি নিয়া তাড়া করিবে, আর বড়-মা, সে ত শয্যাগত, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার আর কে আছে। যদি বড়মা মারা যায়, তাহা হইলে রূপগঞ্জের যত সম্পর্ক চিরদিনের তরে তাহার উঠিয়া যাইবে, ...না, না...সে আর ভাবিতে পারেনা।

কমলার অসুখের পর হইতেই বেণুবাবু যেন কেমন মন-মরা হইয়া গিয়াছেন। কমলা যে পলে পলে নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল, ইহা সতী দিনকয়েক যাবৎ বেশ ভালো বুঝিতেছিল। সেদিন কমলাকে দেখিতে গিয়া এই ধারণা তাহার আরও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিতেই সতী কহিল, ওগো শুনচ,

দিদিকে তুমি একবার দেখে এলেনা কেন। দিদির অবস্থা নাকি আজ খুব খারাপ।

পান্নুবাবু চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন, কে বল্‌লে? তুমি গিয়েছিলে নাকি?

—গিয়েছিলাম বৈকি! তুমি একবার যাওনা, দেখে এস, দিদি ত আমাদের পর নয়। দাদার সাথে তোমার ঝগড়া থাকতে পারে, কিন্তু বৌঠান ত সে চোখে তোমাকে কোনদিন দেখেনি। সেবার তোমার অসুখের সময় তিনি কতবার এসে দেখাশোনা করেছেন।

পান্নুবাবু হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন ভোর না হইতেই পান্নুবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া বসিলেন। রাত্রিতে কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আর ভালো ঘুমাইতে পারেন নাই! তেতলার ছাদে পায়চারি করিতে করিতে তাহার মন অসহ ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল।

হল্‌দে রোদের ঝিলিক গাছের মাথায় মাথায় আসিয়া না পৌছিতেই পান্নুবাবু পাগলের মত বড় বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন। ছোটবাবুকে উপরে উঠিতে দেখিয়া ঝি-চাকরেরা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গেল। ভোলাকে ডাকিয়া পান্নুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা কোথায়?

ভোলা তাহাকে দ্বিতলের একটা কক্ষে লইয়া গিয়া চুপি চুপি কহিল, শুয়ে আছেন বোধ করি, সারারাত একটুও ঘুমুতে পারেন নি! বড় খারাপ অবস্থা গেছে মার, জেলা থেকে হেরম্ব ডাক্তার এসেছেন কাল! মা আর বাঁচবেন না বাবু, বলিয়াই ভোলা কাপড়ের খুঁটে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া কোনমতে কহিল, খোকাবাবুকে কাল নাকি রাত্রিতে একবার দেখতে চেয়েছেন।

পান্নুবাবু স্তম্ভিত হইয়া দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পায়ের

শব্দ শুনিয়া কমলা ধীরে ধীরে কহিল, কে এসেছে, ফটিক? কামিনী এখনও ফিরে এল না?

পানুবাবু চোখের জল চাপিয়া কহিল, আমি, বৌঠান!

—কে, ঠাকুরপো! এতদিন কোথায় ছিলে! আমি যে চলেছি ভাই। ফটিককে যে আর দেখতে পেলুম না! একটা কথা রাখবে ভাই? তুমি তাকে কিছু বলোনা। সে ভয়ে এ গাঁ ছেড়ে চলে গেছে, আর আসবে না। তার কোন দোষ নেই, সব আমার···

পানুবাবু তাহার পায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, বৌঠান, তুমি ভালো হয়ে ওঠ, সে আবার ফিরে আস্‌বে। আমি তাকে কিছু বল্‌ব না। সে তার মামার বাড়ীতে আছে, সেখানে পড়াশোনা করছে।

কমলার চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল, পানুবাবু মুখ নীচু করিয়া কহিলেন, ওকি বৌঠান অমন করছ কেন!

তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া আসিতে লাগিল।

কমলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে আস্তে আস্তে কহিল, একবার তাকে খবর দিতে পারো ঠাকুরপো, একবার তাকে শুধু দেখব। একটিবার।

পানুবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমি গোরাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কমলা হাত নাড়িয়া কহিল, গোরাকে পাঠালে সে আস্‌বে না যে, সে আমি খুব ভালো জানি! যদি তুমি···একবার,···তুমি কি যাবে ঠাকুরপো ···কামিনীর মা গিয়েছিল তাকে আন্‌তে, সে বুঝি এল না···

পানুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, কেন যাবো না, এখনই আমি যাচ্ছি।

তাহাকে আর কোন কথা বলিতে হইল না! বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই পান্নুবাবু দেখিলেন, কামিনীর মা এক গাল হাসি মুখে আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

পান্নুবাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, ফটিক আসেনি ?

কামিনীঝি একটু দম লইয়া কহিল, এসেছে, আপনার ভয়ে ঘরে আস্‌ছে না……

কমলা পান্নুবাবুর দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর আমি মরব না, ঠাকুরপো, তোমরা পাশের ঘরে যাও, দাদার সাথে কি ঝগড়া-ঝাটি করতে আছে। মামলাগুলি সব মিটমাট করে ফেল গে, একটা ডুমুর গাছ গেছে, আরো কত টাকা উকিল মোক্তারে খেয়েছে, এখন তোমাদের হুঁস হওয়া উচিত! ওগো যাও না ?……

পাশের ঘর হইতে ফটিক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্যেঠামহাশয়, বাবা এবং অন্যান্য গুরুজনের পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। কমলা হাসিমুখে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, খেয়ে আসিস্‌নি বুঝি, তাই মুখখানি অমন শুকিয়ে গেছে। পটল, রসিক ঠাকুরকে একবার ডেকে দেত মা…

"অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে——"

বিয়ে হওয়ার পর অনেক দেখা-শোনা হইয়াছে, কিন্তু অগোচরেও দেখা-সাক্ষাৎ কম হয় নাই, এ-কথা একজনে জানে, অপরে জানে না! বৌদি কম দুষ্ট নয়, দাদাও তার চেয়ে কম নয়, এই কথা মনে মনে ভাবিয়া রাণুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঘাটে নৌকা ভিড়িতেই দেশ-বিদেশের যত লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিল, পীরগাছার দশ-আনির জমিদার রমাকান্ত গাঙ্গুলী কন্যা, স্ত্রী, পুত্রবধূসহ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেই হালফ্যাসানের পুত্রবধূ সুধাকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল! সাধারণতঃ হাটে-বাজারে দোকান-পাটে পেঁচার ওপর লক্ষ্মীর যে মনোরম ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে এই মা-লক্ষ্মীর চেহারা আরো শতগুণে ভাল। গাঙের পাড়ে যেন চাঁদের হাট বসিয়া গেল। নিতাই আগাইয়া আসিয়া কর্ত্তার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেই রমাকান্ত মৃদু হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভাল ত সব! সমাগত লোকজন, ইতর-ভদ্র সকলেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত, এমন সদাশিব লোক সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না! গ্রামবাসীরা উপস্থিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যে যার দিকে চলিয়া গেল!

পূজার ভিড়ের অন্ত নাই। সহসা গ্রামের লোকসংখ্যা ত বাড়িয়াছেই, হাট-বাজারের মাছ-দুধ, তরি-তরকারীর দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বেচাকেনা আগের চেয়ে অনেক জোরে চলিয়াছে। এখন আর মহেন্দ্র পাঠক, নারায়ণ-দাদা, বগলা গাঙ্গুলী, চন্দ্রমোহন মুখুয্যের হাট-বাজারে

প্রতাপ-প্রতিপত্তি নাই। দোকানীরা নগদ দামের খরিদ্দার পাইয়া হাতে আকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থা চিরদিন থাকে না। কালীপূজার পর হইতেই গ্রামে আবার লোকের যাতায়াতের মড়ক লাগিয়া যায়।

বাগানে এত ফুল ফুটিয়াছে যে, রাণী দু'সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়াও তাহার আশা মিটাইতে পারে নাই। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছাদের ওপর বসিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ছোটরা ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়, বৌদির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দুরন্ত ছেলেরাও দস্যিপনা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়, কিন্তু রাণীর দাদা অমলের বিষম তাগাদায় বৌদিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া যাইতে হয় দেখিয়া কিশোরী মেয়ে রাণী রাগে গজ গজ করিতে করিতে বলিয়া ওঠে, কি ঘুম বাবা তোমাদের, দশটা না বাজতেই ডাকাডাকি।

সুধা মৃদু হাসিয়া জবাব দেয়, তোরও এমন একদিন আসবে যে, চাঁদের আলোয় বসে আর বেশীক্ষণ গল্প বল্‌া চল্‌বে না…

কি অসভ্য বৌদি, বলিয়াই রাণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, —তোমার মত যেন সবাই।—

—আমিও এমন ছিলুম না রাণী।

—তবে এমনি হ'লে কেন?

—তোমার ওই গুণধর দাদাটিকে জিজ্ঞাসা করো।

—আমার বড় বয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করতে। আর দাদার কথা আমরা জানি না। বিয়ের রাত্রিতেই না পালিয়েছিল রাগ করে। কত সাধ্যসাধনা করে দাদাকে এবার আনিয়েছে।

সুধা স্মিতমুখে জবাব দিল, তা হ'লে তো বাঁচতুম, না এলে আমার কি মজা হ'ত!

—অত বড়াই করো না বৌদি, আমরা জানি না কিছু, সবই মনে আছে।

—তোমার মনে থাকবে না তো কার মনে থাক্‌বে। তুমি যে এখন রিহার্শেল দিচ্ছো, বলি, বর আসবার আর ক'দিন বাকী। বাবাকে বলবো, এবার আসছে ফাগুনেই যেন একটি ঠাকুরজামাই দেখে আনেন।

রাণীর গাল দুটি সহসা আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল, কহিল, ও-সবে আমার কাজ নেই বৌদি। তোমার জামাই নিয়ে তুমিই থাকো।

সুধা রাণীর গাল দুটি টিপিয়া দিয়া কহিল, সবাই বিয়ের আগে ওকথা বলে, শেষে কাজ কাব থাকে বেশ বোঝা যায়।

রাণী রাগতভাবে কহিল, ভাল হবে না বল্‌ছি বৌদি, আমি দাদাকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

—ওরে বোকা, তোর বলতে হবে না, আমি নিজেই বল্‌ব—বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া সুধা রাণীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ কবিয়া কহিল, রাঙা বর ত, আমি ভুলে যাবো না, কক্ষণোও না।

রণে ভঙ্গ দিয়া রাণী দুমদাম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। ছেলেমেয়ের দল বিষম হল্লা করিতে করিতে নামিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা অমল ঘুম হইতেই উঠিয়া দেখে, ঘরে-বাহিরে পথেঘাটে লোকজন গম্ গম্ করিতেছে। ঘোষাল-মশায় এই ভোরেই স্নান-আহ্নিক সারিয়া গায়ে রক্ত নামাবলী দিয়া কি একটা সংস্কৃত শ্লোক অস্ফুটকণ্ঠে আওড়াইতে আওড়াইতে খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া কাশিয়া অন্দরে ঢুকিয়াই কহিলেন, কবে এলে অমল ?

অমল প্রণাম করিয়া কহিল, কাল এসেছি।

—বৌমা আসেনি ?

কৌতুক করিয়া অমল জবাব দিল, জানি না, দেখা হয়নি। কাদম্বিনী-মাসী কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। একগাল হাসিয়া কহিলেন, দেখা আবার হয়নি !

ঘোষাল ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুই কবে এলি কাদু ?

কাদম্বিনী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, এই তো এলাম আজ সাত দিন। আপনি কেমন আছেন ?

—আছি কাদু প্রাণগতিক, শৈলেশ আমাকে কাঁদিয়ে এবার বর্ষাকালে চলে গিয়েছে।

কাদম্বিনী বিস্ময়ে, দুঃখে চোখ দুটি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, বলেন কি ঘোষাল-কাকা ? এমন সর্ব্বনাশও কারো হয় ?

এমন সময় মহিম পাঠক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, অনিত্য সংসারে খলু ধর্ম্মসার বলিয়াই সকল কথা চোখের নিমিষে উড়াইয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন, ঘোষাল-বাড়ীর উমাকান্ত এখনো আসেনি, তাই সেখানে সতীশ-দাদাকে বড় মন-মরা দেখলাম, চলুন দাদা একবার ওপাড়া হয়ে আসি।

নদীর তীর দিয়া পথ। সে পথ ধরিয়া খানিকটা যাইতেই মহিম পাঠক হর্ষোৎফুল্ললোচনে দূরের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ যে উমাকান্ত এসেছে না, ঐ যে নৌকায় বসে···সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তীরে নামিতেই ছেলেবুড়োর দল তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। ঘোষাল খুশী হইয়া কহিলেন, এসেছ বাবা, বেশ করেছ, এত দেরী হল কেন ?

—আর বলবেন না কাকা সরকারের চাকুরীর কথা। বড়বাবুর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল ব'লে আমাদের কারও ছুটি পাওয়ার আশা ছিল না।

—বলো কি হে, এজন্য তোমাদের ছুটি একেবারে বন্ধ !

—খোসমেজাজ না হ'লে কি ছুটি মেলে। শেষে শোনলাম, স্ত্রীর সাথে ভাবও হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছুটি।

—বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে। তোমাদের সাহেব বুঝি "দৌড়ায়" থাকেন বেশী।

মহিম পাঠক সায় দিয়া কহিলেন, সাহেবরা আর কি কাজ করে, খায়-দায়, ফুর্ত্তি করে, মোটা মাইনে পায়, তাদের আবার কাজকর্ম্ম!

নবীনখুড়ো ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, ওদের দাঁতের একটু বুদ্ধি আমরা রাখি।

মহিম পাঠক প্রতিবাদের স্বরে কহিলেন, দাঁতের বুদ্ধি না রাখি সত্য, কিন্তু কি পাস ওরা। বিলাত থেকে এলেই হয়ে গেলেন জজ-মাজিষ্ট্রেট। এই ধরো আমি, ঈশান-কাকা, ভগবান-দাদা আমরা বিলাতে জন্মালে এক একজন্ দিগ্‌গজ হ'তাম কিনা তুমিই বলো নবীন-খুড়ো!

ছেলেবুড়ো সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। নবীন-খুড়ো কোন উচ্চবাচ্য করিল না দেখিয়া সনাতন মুদী গম্ভীর স্বরে কহিল, কর্ত্তা আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা কি কম। লোকে বোঝে না, এই যা দুঃখ! তা না হ'লে আপনি থাক্‌তে লোকনাথ মাইতি হয় স্কুলের সেক্রেটারী আর মদন ঘোষাল স্কুলের হেডমাষ্টার!

মহিমের কাছে সনাতন কিছু টাকা ধারিত এবং এই সেদিন মাইনে অনেক দিন না-দেওয়ার দরুণ সনাতনের থার্ড ক্লাসের পড়ুয়া ছেলেটির নাম মদন ঘোষাল হঠাৎ কাটিয়া দেওয়ায় সনাতন গ্রামে গ্রামে লোকনাথ আর মদনের দুর্নাম করিয়া বেড়ায়। এক সময়ে সে পয়সা-ওলা লোক ছিল, কিন্তু একটা স্বদেশী ডাকাতি হওয়ায় সনাতন একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

মহিম বিজ্ঞের মত হি হি করিয়া হাসিয়া জবাব্ দিল, তোরই কি কম বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল। দিন থাকলে তোকে আমরা সেক্রেটারী করে দিয়ে তোর বাবার নামে স্কুল চালাতাম, কি বলো খুড়ো?

নবীন-খুড়ো বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সনাতন কি সে কথার লোক, আমি সে-বছরও বলেছিলাম, 'সনাতন, হাজার তিনেক টাকা দিয়ে স্কুলের বড় ঘরটা তুই বানিয়ে দে,' তোর বাপের নামে আমরা স্কুল করি; ওকি আর কথা শোনবার লোক। এখন তোর টাকা-পয়সা বারভূতে মিলে লুট করে নিয়ে গেল।

সনাতন ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আগে জান্‌লে আমি ব্রাহ্মণসেবায়ও…

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মহিম পাঠক লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, এই একটা কথার মত কথা বলেছিস্। আর এই গাঁয়ের চৌকিদার-ব্যাটারা কি চশমখোর, একবার খবর পর্য্যন্ত নিলে না।

—আর চৌকিদার। কাল তারিণী দাদার কালো হৃষ্ট-পুষ্ট পাঁঠাটি মাধব দফাদার বেমালুম গাফ্ করেছে। নবমী পূজার পাঁঠা খেয়ে কেউ কখনও হজম করতে পারে। তাই তো চব্বিশ ঘণ্টা পার না হোতেই মেয়েটার বিষম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি! কলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য এখনো যায় নি।

সনাতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল পাণিকাউর কৈবর্ত্তকে দেখিয়া। পাণিকাউর মাধবের ভগ্নীপতি, সুতরাং এই প্রসঙ্গ এখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

বৈকালে সুধা, রাণী, সকলেই প্রতিমা দেখিতে বাহির হইয়াছিল। গ্রামদেশে অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম এখন আর নাই। সুধা বেথুন কলেজে আই-এ পড়ে, শুধু লোক-লজ্জার খাতিরে একটু ঘোমটা টানিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। কখনো ঘোমটা অনভ্যাসের বশে খসিয়া যাইতেছিল, আবার তাড়াতাড়ি টানিতে গিয়া বিষম অসুবিধা বোধ হইতেছিল। তাহার সুন্দর ঢল-ঢলে মুখখানি, নিখুঁত, নিটোল স্বাস্থ্য গ্রামের বৃদ্ধদের

দু'চার জনের যে চোখে না পড়িয়াছিল এমন নয়। ভগবানদাদা চোখেমুখে গিলিবার মত ভাবে চাহিয়া কহিলেন, মেয়েটি কে হে খুড়ো, বড় নির্লজ্জ দেখ্‌ছি। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মেয়েদের চালচলন আজকাল···

নবীন-খুড়ো জিভ কাটিয়া চুপি চুপি কহিলেন, বড়-বাড়ীর অমলের বউ।

অমনি ভগবান-দাদা সুর নামাইয়া কহিলেন, বেশ তো হাসি-খুশী, কোন দেমাক-টেমাক নেই দেখছি। আমি ভেবেছিলুম নেপালের মেয়ে ননী বুঝি! খাসা বউ এনেছে কিন্তু।

—তা আর বল্‌তে, যেন দুর্গাপ্রতিমাখানি, আমি বারে বারে চেয়ে তাই দেখছিলাম।

পাড়ার মেয়েরা নূতন বৌকে দেখিয়া মুখখানি মলিন করিয়া ফিরিয়া গেল। স্ত্রীলোক সুন্দরী হইলে অপরাপর মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব! কারণ বাংলা দেশের তেলে-জলে অমন রূপ, চেহারা কদাচিৎ দু-একটী দেখা যায়। তাই স্বভাবসুলভ ঈর্ষাপ্রযুক্ত হইয়া ওপাড়ার কাঞ্চন মাসী সুর চড়াইয়া কহিলেন, সুন্দরী বুউ ঢের ঢের দেখেছি, তোদের পীরগাছায় এই নূতন হ'তে পারে। আমার মেজঠাকুরের সেজঠাকুরঝিকে দেখ্‌লে ওকে দেখা যাবে একেবারে কালো।

মল্লিক-বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছিল। পানের খিলি মুখে পূরিয়া বোস্‌দের গিন্নিমা কাত্যায়নী চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, এ আর কি বউ দেখছিস্‌, নাটোরের নাম শুনেছিস্‌ তো, তারই কাছে বীরকুৎসার জমিদারদের বউ-এর কথা আর কি বলব। চোখ দুটি যেন আকাশের তারা, আর চুলের গোছা পিঠ অবধি ছাড়িয়ে তো গেছেই, পায়ের কাছাকাছি ··· আর নাচগানের কথা যদি বলিস ত আসুক মিত্তিরদের মল্লিকা, কেমন গলা দেখে নেবো!

কাঞ্চনমাসী গলা ছাড়াইয়া কহিলেন, আমার পান্নুর বউয়ের রঙ যদি আর একটু ফরসা হ'ত তোমরাই তাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বল্‌তে কি না বলো।

বিমলা মৃদু হাসিয়া কহিল, অমলের বউয়ের মত সুন্দরী বউ খুব কমই দেখেছি, যে যা-ই বলো না কেন!

কাঞ্চনমাসী চোখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি বল্‌লি লা, তোরা কয়টি সুন্দরী বউ চোখে দেখেছিস্ আর কয়টি সুন্দরীর নাম করতে পারিস। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে গিয়ে ঢাকায় উমাকে দেখে এসেছি, তার মত সুন্দরী আর হয় না!

—না হয়, না হোক, আমাদের তাতে কি মাসী, আমরা তো এক রকম বয়স কাটিয়েই গেলাম। এই রূপ নিয়েই তো যত গোলমাল শুনি, তার চেয়ে রূপ না থাকাই ঢের ভাল!

মুখুয্যেদের মেজবউ সৌদামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, অমলের বিয়েতে কি যে কাণ্ড হয়েছিল, শোনেননি বুঝি, এ-কথা তো সবারই জানা—বলতেই পাড়ার মেয়েরা 'এ' ওর গায়ে, 'ও' তার গায়ে ঢলাঢলি করিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে কুটপাট হইয়া গেল!

* * * * *

সুধার বাবা ছিলেন ঢাকা কলেজের প্রফেসার। অমলের সাথে যখন বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়, সুধা তখন টিকাটুলির স্কুলে পড়িত। ছোটবেলা থেকেই সে ভয়ানক দুষ্ট, এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল বলিয়া তাহাকে তেরোতেই পনেরোর মত দেখাইত। সুধার সমপাঠী ছিল বীণা। বীণা বয়সে বড়, একটু উঁচু ক্লাশে পড়িত, তাহাকে একদিন সুধা ধরিয়া বসিল, বীণাদি, আমি আমার বরকে একটু দেখতে চাই!

—বিয়ের আগে? বিয়ের আগে কেউ কি কখনো বরকে দেখে, ধেৎ বোকা!

—না বীণাদি, আমি তার চেহারাটি শুধু দেখবো। কালো চেহারা হলে চল্‌বে না বীণাদি! আমি তো আর কুৎসিত নই।

বীণা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, সুধা, তা'হলে এক কাজ করতে হবে। মেজদাকে বলে একদিন আমাদের বাড়ী নিয়ে আসলে চলবে।

—বেশ তো বলিয়াই সুধা সোৎসাহে চুপি চুপি কহিল, অমল গাঙ্গুলী, থার্ড ইয়ার।

ও থার্ড ইয়ার···মেরী ইয়ার—বলিয়াই বীণা নোটবুকে টুকিয়া রাখিল।

ঢাকা কলেজে বি-এ ক্লাশে তখনো প্রায় দেড়শ' ছাত্র পড়ে। বীণার মেজদা' দ্বিজপদ অমলকে অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিল, কিন্তু অমলের সাথে তাহার তেমন জানাশোনা ছিল না। কি করিবে, বাসায় আসিয়া বীণাকে সব কথা খুলিয়া বলিতেই, বীণা কহিল, এক কাজ করো না মেজদা,' বাসায় নাই বা এলো, আমরা রমনার পথের ধারে যেন বেড়াতে গিয়েছি, ঠিক এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি ইসারায় আমাদের দেখিয়ে দেবে। অমল বাবু তো আর কলেজ হোষ্টেলে থাকেন না!

—না, বলিয়াই দ্বিজপদ মৃদু হাসিয়া কহিল, কাল তা'হলে সব ঠিক কিন্তু। আমি রোজরোজ এ-সব কর্‌তে পারব না।

পরদিন ঠিক কথামত শীতের অপরাহ্নে বীণা ও সুধা রমনার ধারে বেড়াইতে গেল, সাথে হিন্দুস্থানী চাকর গিরিধারী।

দ্বিজপদের ক্লাশ অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, সে অমলের অপেক্ষায় চুপ করিয়া লেবরেটারীতে বসিয়াছিল। ঘণ্টা বাজিতেই একে একে সব ছাত্র চলিয়া গেল, অমলও আসে না, দ্বিজপদও তাহাকে খুঁজিয়া পায় না।

সুধার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কি দেখিতে আজ কি দেখিয়া বসে, সারা জীবনের আধিপত্য দিয়া যাহাকে চিরপতিরূপে মনোরাজ্যে

অধিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া মন খুশী না হইলে চলিবে কেন! এদিকে শাস্ত্রের দোহাই চারিচক্ষু মিলন শুধু মুখচন্দ্রিকার শুভ মুহূর্ত্ত ছাড়া হইতে পারে না, কিন্তু পৃথকভাবে যদি এক জোড়া চোখ অপরের অলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, তাহা হইলে তো আর শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে না। তাহার মনে এইরূপ নানা কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিজপদ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চোখের ইসারায় যে-ছেলেটিকে দেখাইয়া দিল, অমল বলিয়া যদি কিছু তাহার দেহের বর্ণে থাকে। সুধা এক রকম মুখখানি ভার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেই দিন থেকে তাহার মুখে কেহ কোন দিন হাসি দেখে নাই। মায়ের মনে বিষম ভাবনা হইল, অথচ সুধা মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না, আর কোন্ বাঙালী মেয়েই বা পারে!

বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সুধা ততই মনমরা হইয়া গেল। বীণা আভাস-ইঙ্গিতে এ-কথাটি একদিন সুধার জননীর কর্ণগোচর করিয়া ফেলিল। কিন্তু জননী তো হাসিয়াই খুন! ছেলে কালো হইলে এমন কি আসে যায়, অথচ অত বড় বনিয়াদী ঘরের ছেলে সহজে হাতছাড়াও করা যায় না। তবু বীণার কথায় তাহার একটু খট্‌কা বাধিল। তিনি একদিন কর্ত্তার কাছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন! নিরীহ প্রফেসার, সদাশিব লোক, কোনমতে টাল সাম্‌লাইয়া কহিলেন, তুমিও ক্ষেপেছ নাকি, তা'হলে আমিও কালো, কি বলো! কর্ত্তার ভ্রূকুটি দেখিয়া গৃহিণী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হ'ন নাই।

বিবাহের দিন রাত্রিতে সুধা তেমন-কিছু কাপড়চোপড় পরিতে রাজী হইল না, এ যেন এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে বিবাহ দেওয়া

হইতেছে। তাহার মুখের রক্ত কোথায় উবিয়া গিয়াছে এবং কাহারো সাথে কোন কথাবার্ত্তা বলা সে আদৌ পছন্দ করিল না। বীণা ইচ্ছা করিয়াই আসে নাই, এবং পাড়ার সাথীরা অযথা ধমক খাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে এমন সময় ধীর, স্থির হইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল যে, যেন পার্ব্বত্য কল্লোলিনী উপলখণ্ডে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বিরাট বিপুল বাঁধের কাছে তাহার আকুল, উদ্দাম গতি যেন একেবারে প্রতিহত হইয়া গিয়াছে।

মুখচন্দ্রিকার সময় সে চোখ বুজিয়া রহিল। নতুন জামাই বেচারী সব দেখিয়া শুনিয়া যেন একেবারে ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর, পাড়াপড়শীরা, সমপাঠিরা বার বার বলিয়া উঠিল, চোখ খোল, চোখ খোল, কিন্তু সুধার চোখ দুটি সহসা একবার বিদ্যুতের মত খেলিয়া গিয়া আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া গেল।

গ্রামময় কানাকানি সুরু হইল। রমাকান্ত রায় গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ওসব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা এসব করি নি। আমি ওর মার বিয়েতে কি রকম কট্‌মট্‌ চোখে চেয়েছিলাম, আমার এখনও বেশ মনে পড়ে।

বরযাত্রী ভগবান-দাদা কাঁচের চশমার ভিতর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, ঢের হয়, ঢের হয়, আমি বিবাহের ভয়ে পনেরো বছরে বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়েছিলাম।

আসরে একটা মৃদু হাসির ধ্বনি শোনা গেল। কন্যাযাত্রী ঈশান ঘোষাল কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, ছেলেমেয়েরা সব হ'ল কি, বিয়ের সময় মুখ পেঁচা করে থাক্‌তে এই প্রথম দেখলাম! সত্যর মা আমার দিকে কি রকমভাবে তাকিয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসা করো না ওঁকে,আমার এখনো মনে পড়ে!

সতুর মা দূর হইতে অন্দরে সরিয়া পড়িয়া কহিলেন, বুড়োর কাছে যাবো এখন সাক্ষ্য দিতে! মরণ আর কি?

এতেও কিছু হইত না, কিন্তু ভোর রাত্রিতে বরের হঠাৎ অন্তর্ধানে পাড়াময় ঢি-ঢি পড়িয়া গেল।

থানায় খবর দেওয়া হইল, এবং চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ছেলে শেষে একটা মনে আঘাত পাইয়া কিছু না করিয়া বসে এজন্য রমাকান্ত পুলিসে খবর দিলেন। চারিদিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে, ষ্টিমার ঘাটে সি-আই-ডি পুলিস মোতায়েন হইল, কিন্তু কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। পুলিসসাহেব তদন্তে মহকুমায় আসিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর রমাকান্তের নাম শুনিয়া কনকসার হইয়া গেলেন। এই গ্রামে প্রফেসার মহাশয়ের বাড়ী। পুলিসসাহেব সদলবলে আসিলেন, সাথে পুলিস, পেয়াদা, চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, দারোগা কেহই বাদ পড়িল না।

মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিরাট বৈঠক বসিয়াছিল, এমন সময় পুলিস-সাহেব আসিয়া উপস্থিত। ভগবান-দাদা পিছনের দরোজা দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন, সূর্য্যকান্ত গ্রামের প্রবীণ লোক, সেকালের মাইনর পাস, ইংরেজী কিছু কিছু জানেন, গুডমর্ণিং বলিয়া একরকম বাঁকাইয়া পড়িলেন। গদাধর কবিভূষণ পৈতা বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ছেলে কেন পলাইয়া গেল, গোসা করেছে নাকি? আজকালের দিনে ছেলে বাড়ী না থাকিলে ডাকাতি করিতে যায়।

রমাকান্ত বিবর্ণমুখে জবাব দিলেন, বিবাহ করিতে আসিয়া পলাইয়াছে।

—বিবাহ করিতে আসিয়া মেয়ে নিয়া পালাইয়াছে, elopement নিশ্চয়ই।

ভগবান-দাদা মৃদু হাসিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, হুজুর, আলাপ করেনি, এমনিই গিয়াছে।

রমাকান্ত চোখ টিপিয়া চুপি চুপি কহিলেন, আলাপ না, ইলোপ, এটা একটা খারাপ ইংরেজী কথা।

দাদা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া কহিলেন, আলাপ-টালাপ হ'লে কি হুজুর পালায়!

সাহেব কহিলেন,—মেয়ে বুঝি beautiful না?

আজ্ঞে মেমসাহেবের মত সুন্দরী—বলিয়াই ঈশান পাঠক আগাইয়া আসিলেন।

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কহিলেন, বোধ হয় ঝগড়া হইয়াছে, শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে।

ঈশান পাঠক মাথা নাড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা'-তো যাবেই। আমাদের শাস্ত্রেও আছে,—অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে—দম্পতি কলহেশ্চৈব—উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা মনে মনে অনুভব করিয়া বোকার মত পরে একটু হাসিলেন। দারোগা সাহেব বকাউল্লা ইংরেজী করিয়া বলিতে গিয়া হয়রান হইয়া উঠিল। অনুবাদ বোধ হয় এই রকম করিয়াছিল—

Goats fighting, Sradh ceremony of Rishis, and morning clouds, quarrel between husbands and wives are mere farce.

সাহেব কি বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভাল জানি না।

পরে অমলের খোঁজ পাওয়া গেল। সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত। কিন্তু সুধার বাবা এ-খবর ভাল করিয়া জানিতেন না। তিনি তখন বদলি হইয়া বেথুন কলেজের প্রফেসার হইয়া আসিয়াছিলেন। বৈবাহিকের পত্রে কুশলপ্রশ্ন মাঝে মাঝে পাইতেন সত্য, কিন্তু অমলের বিষয়ে কোন সংবাদ তিনি ইচ্ছা করিয়াই লিখিতেন না। রাগ, অপমান,

ক্ষোভও তাঁহার কম হয় নাই। তিনি রমাকান্ত গাঙ্গুলী—পীরগাঁছার প্রকাণ্ড জমিদার, তাঁহার এত বড় একটা অপমান হইয়া গেল, কতকগুলি নগণ্য পল্লীবাসীর সম্মুখে, তাঁহার মনেপ্রাণে এই অসহ ব্যথা বড় বাজিল, কিন্তু আপাততঃ কোন উপায় নাই ভাবিয়া বাঘের শিশু চিড়িয়াখানার লৌহপিঞ্জরে বন্দী হইয়া মনে মনে আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধা ম্যাট্রিক পাস করিয়া বেথুনে আই-এ পড়ে। অমলের কথা সে কোন দিন মুখে আনে নাই। ক্লাশের সমবয়সীরা তাহার সিঁথিতে সিঁদুর দেখিয়া বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বিষম ক্ষেপিয়া ওঠে। কেহ কেহ ঠাট্টা করিতেও ছাড়ে না। একদিন অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, ঝগড়া করেছ বুঝি, বলো না ভাই, আমরা সব মিটিয়ে দি'।

নিভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ও আবার ঝগড়া কি? বীণার কথা মনে নেই? দু-দিন বাদেই আবার অজ্ঞান!

কমল হাসিয়া কহিল, মিলনে বিরহ না থাকলে তত মধুর হয় না। সুধা মলিন মুখে জবাব দিল, ওসব কিছু নয় ভাই, তোমরা আমায় জ্বালাতন করো না, আমি কখনো বলেছি যে, ঝগড়া হয়েছে, আমার সাথে একদিনও দেখা হয়নি।

ওমা বল কি, বলিয়া সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

নিভা সমঝদার মেয়ে, আসল ব্যাপারটি যেন মনে মনে অনুধাবন না করিয়া কহিল, তাইতো তোমাকে অত মনমরা দেখি, বর বিলেত গিয়েছে বুঝি!

—তা' আমি কি জানি?

—তুমি জান না তো, কি আমরা জানি?

—আচ্ছা, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে খবর নেব।

সুধা কথা কহিল না, শুধু একটু রঙীন আভা তাহার মুখের উপর হঠাৎ খেলিয়া আবার চোখের নিমিষে কোথায় উবিয়া গেল।

অমলের উপর সুধার রাগের কারণ এবং এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব সে এখনো ভাল করিয়া বোঝে নাই, এবং জানে না। অথচ সুধা অপূর্ব্ব সুন্দরী, এমন বউয়ের কথা কোন্ না যুবক ভাবিয়া থাকিতে পারে? সে ইহার একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল এবং তাহার ছোট বোন রাণুর কাছে সুধার বাবার ঠিকানার জন্য চিঠি লিখিয়া দিল। সে অভিমান করিয়াই বিয়ের রাত্রিতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই অভিমান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ বিবাহের সময় যদি মেয়ে ঘৃণায় তাহার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে, এ কি কম আপশোষের কথা, আর কেনই বা করিবে,—সে কি তার চেয়ে কম? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, ধনে-জনে অমলের মত একটি ভাল ছেলে বাংলা দেশে নিতান্তই বিরল।

নিভা সুধার বাবার কাছ থেকে বেশী কিছু খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই, কিন্তু তার দাদা সমর একদিন কথায় কুথায় বলিয়া ফেলিল, আমাদের সাথে পীরগাছার জমিদারের ছেলে অমল গাঙ্গুলী বলে একজন পড়ে, তুমি কি তার কথা আমার কাছে বলেছ সে দিন? ওর সাথে আমার খুব ভাব, কিন্তু ষ্টুপিড বলে, বিয়ে করেনি, আমি ভেবেছিলাম—

নিভা হাতে আকাশ পাইয়া কহিল, হ্যাঁ দাদা, অমল গাঙ্গুলীর কথাই বল্‌ছি, ওদের বাড়ী আমাদের ঢাকায়, ওরা খুব বড়লোক।

সমর একটু ভাবিয়া কহিল, বিয়ে তা'হলে হয়ে গেছে!

—না, তোমার জন্য বাকী আছে!

—কিন্তু তাকে বড় আনমনা দেখি! তোর সাথে এক দিন আলাপ করিয়ে দেব?

—শুধু আলাপ করিয়ে নয়, একদিন আমাদের এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করো। আর সুধাকে আমার বোন বলে ওর কাছে পরিচয় দেবে, সাবধান দাদা, কখনো পরিচয় দিয়ো না কিন্তু।

—আহা বেচারীকে তোর কথা একদিন বল্‌তেই কত সুখ্যাতি করলে তোর।

—এই না দেখেই!

—না রে বোকা, দেখার কথা তো ওঠেনি। তুই যে রেডিয়োতে গান গেয়েছিস্‌, সে কথা শুনে একেবারে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল।

—তুমি বড়ো বাইরের ছেলেদের সাথে ইয়ারকী দাও দাদা, আমি এ সব পছন্দ করি না। মেয়েদের কথা নিয়ে তোমরা এত অসভ্য আলাপ করো, এ কিন্তু তোমাদের ঠিক নয়।

—আর তোমরা ছেলেদের নামে কম বলো, আমরা বেথুন কলেজের মেয়েদের কথা জানি না। আচ্ছা, তুমিই বলো কি না?

—অত তীব্র আলোচনা করি না, এ-কথা তুমি ঠিক জেনো—বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য অমল বাবু, নিজের স্ত্রী থাক্‌তে—

—আর আমরা তো এ-কথা কল্পনায়ও আন্‌তে পারি না।

সমর বাইকে ছুটিয়া গেল অমলের মেসে চায়ের নেমন্তন্ন করতে।

সুধা শুধু আসিয়াছিল চায়ের নিমন্ত্রণে। ঘরখানি এমন সুশ্রী ভাবে সাজানো হইয়াছিল, দেখিলে সহজেই চোখে পড়ে। ফুলের গন্ধে, তীব্র আলোকে, রঙীন পর্দ্দায় ঘরখানি ঝলমল করিতেছিল। অমল আসিল, বসিতেই সমর পরিচয় করাইয়া দিল, এই দুটি তার বোন, এবং মেয়েদের কাছে অমলের কথা শুধু বলিল, ইনি আমার সমপাঠী এবং কবি।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আষাঢ়ের নবঘন মেঘ দেখিয়া সে দুই-চারিটি

বিরহের কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল; এ-ব্যাসিলি আজকাল স্কুলে, কলেজে এমন কি পল্লীর আনাচে-কানাচেও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে।

নিভা দু-একটা গান গাহিয়া অমলকে শোনাইল। অমল একেই গানের নামে পাগল। সে সমরের দিকে চাহিয়া ইসারা করিতেই সমর সুধার দিকে চাহিয়া কহিল, সেই গানটি তোমার মুখে খুব ভাল লাগে। সমর সুধাকে নিভার সমপাঠী হিসাবে "তুমি" সম্বোধন করিত।

সুধা গান ধরিতে নিভা মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া'

অমল নিভার দিকে চাহিয়া, তাহাকে এরকম ভাবে মুখ টিপিয়া হাসিতে দেখিয়া কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তবু সে একটুও ঘাবড়াইবার ছেলে নয়, কবির মত উদাসভাবে সুধার দিকে বার বাব চাহিয়া দেখিতেছিল। সমর ভাব-সাব বুঝিয়া নিজেই অর্গানটি টানিয়া লইয়া জলদগম্ভীর স্বরে গান ধরিল। তবে তার গলা তেমন মিষ্টি নয়, সে এক-আধটু গাহিতে জানে,—

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে…'

নিভা মুখে রুমাল দিয়া হাসি চাপিয়া রাখিল। সুধা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারে নাই, সে অমলের দিকে একবার চোখ ঘুরাইয়া আবার সমরের গান গাহিবার ভঙ্গীতে মনে মনে একটু হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি অধিক না হইতেই যে যার দিকে পারিল বিদায় লইল। সমর অমলের মেসে গিয়া সে-রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিল, বাসায় বলিয়া গেল, কাল ভোরে ফিরিয়া আসিবে। সারা রাত্রি দুই বন্ধুতে কত

আলাপ-আলোচনা হইল, তাহা বলিতে গেলে এখানে আর গল্প বলা চলে না।

সমর ইচ্ছা করিয়াই সুধার কথা তুলিল, কহিল, আমার বড় বোনটিকে তোমার পছন্দ হয় ?

—বা রে, ফাজলামি করার আর জায়গা পাও না! বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সীঁথিতে সিঁদুর, তুমি তো আচ্ছা লোক হে!

—রাখো না ভাই, বলতেই দাও না, ওর বিয়ে হয়নি, তবু বেচারী সীঁথিতে সিঁদুর দেয় কেন জানো, বলে আমি মনেপ্রাণে একজনকে ভালবাসি, কিছুতেই নাম বলে না, শেষে দেখি চিত্রা পত্রিকায় তোর যে সেই কবিতাটি বেরিয়েছিল, সেই যে—পল্লীপ্রিয়ারে স্মরি—সেই কবিতার লেখককে ও মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছে। এমন ভালবাসায় যে কতখানি risk তা' ও কি করে বুঝবে বলো তো। ধরো না, প্রথম, লেখক বুড়ো না যুবক বোঝা ভার, তারপর বিবাহিত হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ও বলে কি জানো,······বুড়ো হতেই পারে না, কারণ এ রকম কবিতা বুড়োদের পক্ষে লেখা অসম্ভব, আর বিয়ে হ'লে কি কেউ কখনো পল্লীপ্রিয়ারে স্মরিয়া অত বিরহের কথা লিখ্‌তে পারে······

—খুব পারে ভাই, এ-কথার কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস হয় না ভাই।

—কি বিশ্বাস হয় না,······ ও যে তোকে ভালবাসে, এই কথা ?

অমল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এ কিন্তু ভারি অন্যায় সমর, তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই, আমার বিয়ে হয়ে গেছে এ-কথাটি তুমি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়ো!

সমর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বলিস্ কি, সর্ব্বনাশের কথা, আমি ওকে বলে রেখেছি, এ-বিষয়ে অমলের মত নিশ্চয়ই হবে,

আর তোমাকে এতো মেলামেশা করিয়ে তুমি এখন বলো কিনা তুমি বিয়ে করেছ। আমি ভাই এ-সব বল্‌তে পারব না। তুমি বুঝিয়ে একদিন বলে এসো !

অমল এই কথা শোনার পর একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, সত্যই তো সমরকে সে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিয়াছে, এখন তো বিবাহ করা ছাড়া আর উপায় নাই। কি করিবে সে, পিতামাতার অগোচরে সে সমরের বোনকে বিবাহ করিয়া ফেলিবে ! রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেলে পর তাহার চোখে ঘুম আসিয়াছিল। সমর খুব ভোরে উঠিয়া মেস হইতে চম্পট দিয়াছিল, শুধু মেসের ঝি তাহাকে সদর দরোজা খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

কলেজের ক্লাশে সুধা নিভাকে কহিল, ছেলেটি কিন্তু বেশ শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক।

নিভা মুচকি হাসিয়া কহিল, আমার বর হবে ভাই কি বলো, কেমন সুন্দর চেহারাখানি, না ভাই !

—সে কথা আর বল্‌তে। তোমার অদৃষ্ট ভাল, না হ'লে এমন সুন্দর বর……

বাধা দিয়া নিভা কহিল, আর তোমার কপাল বুঝি মন্দ। তোমার বরও তো এমনি সুন্দর, সেদিন যে মাসীমা বল্‌লেন।

যাও ভাই, আর কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে লাভ কি বলো ত ?

—আমি সত্যি বল্‌ছি ভাই, পরে কথাটি ঘুরাইয়া কহিল, কাল আমাকে দেখ্‌তে এসে তোমাকেই পছন্দ করে গেছেন। দাদা যেমন বল্‌লেন ওর বিয়ে হয়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মূর্চ্ছা আর কি ! আজও নাকি খুব কান্নাকাটি ক'রছেন। দাদা আজও তাকে নিয়ে আসবেন

আমাদের এখানে। তুমি ভাই আমার কথা একটু বুঝিয়ে বল্‌বে ওকে !

সব কথা শুনিয়া সুধা জবাব দিল, কেন বল্‌বো না ভাই, ওকে আমি তোমার সামনেই সব কথা বুঝিয়ে বল্‌বো।

—বলো কিন্তু ভাই, এ-বিষয়ে তোমার কাছে আমরা হার মানি। পুরুষদের সাথে টেক্কা দিতে তোমার মতো মেয়েই চাই। প্রত্যুত্তরে সুধা আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আবার সেই চায়ের মজলিস। নিভা ভাবের আবেশে গান ধরিল,—

"সন্ধ্যা রাণী, সন্ধ্যা রাণী,
এই ত মোদের গোপন মিলন, কেউ জানে না আমরা জানি।"

সমর সেদিন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কখনো ঘরের ভিতরে আসিয়া বসে, আবার বাহিরে গিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরে······

"সন্ধ্যা রাণী, সন্ধ্যা রাণী,
এই ত মোদের গোপন মিলন, কেউ জানে না আমরা জানি।"

গান থামিয়া গেলে অমল কি কথা বলিবে, এমন ভাব প্রকাশ করিতেই সুধা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আপনাকে যেন একটু আনমনা দেখছি আজ।

অমল ঢোক গিলিয়া কোনমতে মাথা নীচু করিয়া কহিল, আপনার প্রেম অক্ষয়, অব্যয়, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নেবেন না, আমি—বি—বা—হি—ত—বলিতেই তার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল, পরে আবার কহিল, সমর আপনাকে ভুল বলেছে।

সুধা আগাগোড়া না বুঝিয়া কহিল, তার মানে ?

—আপনি যে আমাকে এত ভালবাসেন, আমি সে ভালবাসার

অযোগ্য…অমল এ-কথা বলিতেই সুধা বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, কাকে কি বল্‌ছেন আপনি, আমার নাম নিভা নয়, আমি আপনাকে কোনদিন ভালবাসি নি, আমার স্বামী আছেন।

সুধার চোখের দিকে আর তাকাইতে না পারিয়া অমল ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া করজোড়ে কহিল, সমর বলেছিল, আপনি নাকি—

ওসব বাজে কথা, আপনি কি বলছেন পাগলের মত, আপনার একটা লজ্জাসরম নেই!

নিভা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, ঠিকই বলছেন অমল বাবু, এই যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী সুধা। সুধা, স্বামীকে তুমি চিন্‌তে পারো নি, এর নাম অমল গাঙ্গুলী, পীরগাছায় এদের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর কথা ভুলে গেছ…

সুধা ফ্যালফ্যাল চোখে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কে স্বামী, তুমি ভুল বলছ নিভা, আমি নিজের চোখে দেখেছি……

ছাই দেখেছ তুমি, ওদের ক্লাসে দুইজন অমল গাঙ্গুলী ছিল, সে সব খবর আমরা পেয়েছি। তোর চেয়ে আর দ্বিতীয় বোকা পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

সুধা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে একেবারে উপুড় হইয়া অমলের পায়ের কাছে ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেল।

অমল ভ্যাবাচ্যাকা গঙ্গারামের মত বায়োস্কোপের চলচ্চিত্র দেখিতেছিল, অমনি বলিয়া উঠিল, এ-সব ব্যাপার কি রে সমর।

সমর পর্দ্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া সুর ধরিয়া কহিল,

'ছিলে কালাচাঁদ হ'লে গোরামণি
তোমারে না দেখা ভালো—সখিরে……
যুগে যুগে তুমি হও অবতার
ভানুর কিরণে আলো……সখিরে।'

* * * * *

সকল ব্যাপার শুনিয়া দেখিয়া অমল আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সমর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আবার গাহিয়া উঠিল, 'ধৈর্য্যং রহু, ধৈর্য্যং রহু···'

* * * *

এখনো পীরগাছা গ্রামে লক্ষ্যার তীরে বাঁধা-ঘাটে বসিয়া কোন তরুণ তরুণীর মনোমালিন্যের কথা উঠিলে ভগবান-দাদা বিজ্ঞের মত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন······

অজাযুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে······

ঈশান ঘোষাল ফোড়ন দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন, দম্পতি কলহেশ্চৈব······

একটা বিষম হাসির হর্‌রা ছুটিয়া যায়। মহিম পাঠক শান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া', এর পরে আর গল্প কি! গল্প অতি সহজ, সরল এবং সংসারের দৈনন্দিন ঘটনার মাঝে গিয়া আপনাকে নিমেষে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

নীলার দিদি

শরতের জ্যোৎস্নায় পথঘাট ভাসিয়া গিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল—মেঘমেদুর নীলিমায় আবার ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া হুহু শব্দে ট্রেণ ছুটিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত কামরায় বসিয়া চাটার্জ্জি সাহেব এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন। সাত মাসের মেয়ে গীতা এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি বোধকরি তখন দশটা বাজে। নবোঢ়া পত্নী অনিলা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইতে সফলকাম হইয়াছে, সেদিকে চাটার্জ্জি সাহেবের ভ্রূক্ষেপ নাই!

'ওগো শুনচো তোমার মেয়ের কথা···

চাটার্জ্জি সাহেব মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি নীলা?

আবার তুমি নীলা ডাকছো। আমি ত আর নীলা নই, নীলার দিদি!

অনিলার চেয়ে নীলা নামটি ঢের ভালো।

তা'হলে যে নীলা অভিমান করবে।

চাটার্জ্জি সাহেব হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা নীলা, শিলঙে সবাই তোমাকে নীলার দিদি বলে ডাকে, আর আমি বললেই যত দোষ হয়ে যায়, না?

মুখখানি রাঙা করিয়া অনিলা কহিল, দোষ হয় কি গুণ হয় জানি না। তোমার যা খুসি তাই বলে ডেকো। কিন্তু তা' বলে রাগ করো না যেন।

হাঁ, নিশ্চয়ই রাগ করব—বলিয়া চাটার্জ্জি সাহেব একটু হাসিয়া উঠিলেন।

প্রবাসে সরকারের দপ্তরে বড় কাজ করিয়া চাটার্জ্জি সাহেব বহুদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পাড়াগাঁয়ের নামে তাঁহার গায়ে জ্বর আসে। পাড়াগাঁ' বলিতে চাটার্জ্জি সাহেব শুধু বোঝেন,—ম্যালেরিয়া, ঝোপঝাড়, সাপ শেয়াল, দলাদলি, রেষারেষি—অবশ্যি সে কথা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা বলা চলে না। বাপদাদার আমলে প্রতি বৎসরই পূজায় বাড়ী যাইতেন, ইদানীং আর হইয়া উঠে না। এবার নীলার দিদির জেদাজেদিতে পূজার ছুটিতে শুধু বারো দিনের জন্য দেশে যাইতেছেন।

অনিলা আজন্ম সহুরে মেয়ে। পল্লীগ্রামের নামে তাহার মনপ্রাণ নাচিয়া উঠে। এতক্ষণ খুকীরও কি আনন্দ ছিল। হাত নাড়িয়া মুখে গাড়ী চলার শব্দ অনুকরণ করিতেছিল, ঝক্, ঝক্, ঝক্। তার মা ত হাসিয়াই খুন। কথায় কথায় কহিল, দেশে যাবো, কি চমৎকার লাগছে আমার, আর গীতার কি ফুর্ত্তি জানো!

চাটার্জ্জি সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তোমাদের মেয়েদের ঐ একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না। সেইটি হচ্ছে আতিশয্য—সব তা'তেই একটা কিছু বেশী-বেশী ভাব দেখানো। জানো নীলা, তুমি এখন অফিসারের স্ত্রী, গ্রামে গিয়ে যেন যার তার সাথে আবার মেলামিশা করো না।

চাটার্জ্জি সাহেব যে ভঙ্গীতে কথাটি বলিলেন, অনিলার কাণে এ সব বড় বিসদৃশ শুনাইল। অনিলা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, গ্রামের লোক বুঝি আর মানুষ নয়—কি যে বলো তুমি, বলিয়াই তরল হাসিতে বিরক্তির কণ্ঠস্বর সহসা ডুবাইয়া দিয়া কহিল, এই লাল শাড়িটা পরেচি, কেমন হয়েছে দেখতে বল তো!

—মার্ভেলাস, বলিয়া চাটার্জ্জি সাহেব আলস্য ভাঙিয়া কহিলেন, চাঁদপুরে যখন নামবে, তখন কিন্তু নীল শাড়িখানি পরে নিয়ো। নীল

শাড়িতে নীলার দিদিকে যা মানায় তা' আর কি বল্‌ব! আর তোমার সেই মিনা করা দোদুল-দুল জোড়া—আর সেই হারের পদ্ম-লকেটটি!

রাত্রি বারোটা অবধি বিচিত্র সাজসজ্জার কথা চলিল। সুন্দরী স্ত্রীকে নানা রকমের শাড়ি ও সৌন্দর্য্য প্রসাধনের আধুনিক রুচিসম্মত চাকচিক্যে এবং মনোরম পরিচ্ছদে দেখিতে তিনি বড় ভালোবাসেন। সবচেয়ে আরো ভালোবাসেন, যখন দশজনের সে দৃশ্য দেখিয়া চোখ টাটায় ঈর্ষায়—তখন গর্ব্বে চাটার্জ্জি সাহেবের বুক এক হাত উঁচু হইয়া উঠে!

আথাউড়া ষ্টেশনে চেকার আসিয়া টিকিট দেখিয়া নামিয়া যাইতেই চাটার্জ্জি সাহেব একবার চোখ বুজিবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। গাড়ীর দোলায় অনিলা নিরুদ্বেগে গীতার কাছে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার যে ঘুম আসিয়াছে, এ কথা নিশ্চিত। আর কোন স্ত্রী স্বামী জাগিয়া থাকিলে একটু গা না গড়াইয়া পারেন!

চাঁদপুর ষ্টেশন আসিতেই কুলীর কলরবে, অসংখ্য আলোর ঝিকিমিকিতে চাটার্জ্জি সাহেব ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন।

নীলা ততক্ষণে নীল শাড়ি পরিয়া মখমল খচিত স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া গীতাকে জামা কাপড় পরাইতে ব্যস্ত ছিল।

ট্রেণ থামিতেই পিপীলিকা শ্রেণীর মত যাত্রীর দল হুহু করিয়া নামিয়া পড়িতেছে। তাহাদের তাড়াহুড়া করিবার প্রয়োজন নাই। ষ্টীমার আসিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকী। বরিশাল, ঢাকার যাত্রীরা কে কোথায় গিয়াছে কে জানে, অসংখ্য কেরায়া নৌকার মাঝিরা দেশ দেশান্তরে চলিয়াছে যাত্রী লইয়া। তাহাদের প্রাণে যেন বাবুদের চেয়ে আনন্দ,—উৎসবের মাত্রা আরো অনেক বেশি। দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া ট্যাঁকে টাকা গুঁজিয়া তাহারা দেশে যাইবে, ছেলেপিলের মুখের হাসি

দেখিয়া কত যে শান্তি পাইবে, সে কথা বলিতে গেলে এখানে আর গল্প বলা চলে না।

রীতিমত রৌদ্র উঠিয়াছে। চাটার্জ্জি সাহেব নদীর ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। জলের তোড় দেখিয়া ঘাবড়াইলেন না বটে, তবে মনে মনে একটু ভয় হইল। নদীর ওপারে বাজার, পাটের গুদাম, অসংখ্য বাড়ি, ঘর, দ্বিতল বাটি, আইস্ ফ্যাক্টরীর বড় বড় টিনের ঘর মন্দ লাগিল না, তবে নীলাকে এই সব বাড়ীঘর দেখাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। এমন সময় রব উঠিল, বরিশাল ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাইতেছে। সত্যিই তাই! অমনি পোঁটলা পুঁটলি, ট্রাঙ্ক, বাক্স বিছানা কুলীর দল আসিয়া টানাহেঁচড়া স্বরু করিয়া দিল। একটু সহ্যগুণ কাহারও যেন নাই। ষ্টীমার যখন চলিতে স্বরু করিল, তখন দেখা গেল, একটি যাত্রীও তীরে বসিয়া নাই। সকলেই আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। তবু এই উঠানামা ব্যাপার লইয়া কত বাক্‌যুদ্ধ, কলহ, ঝগড়া, গাত্রঘর্ষণ, কোলাহল···

মোটে দুই ঘণ্টার পথ, চোখের নিমেষে কাটিয়া গেছে। ষ্টেশনে ষ্টীমার থামিতেই দেশের লোকজন আসিয়া হাজির। এখানে আরদালি বেয়ারার বালাই নাই, তাহাদিগকে না আনিয়া কি বোকামি করিয়াছেন, এইসব কথা নিয়া চাটার্জ্জি সাহেব মনে মনে মাথা ঘামাইতেছিলেন।

নৌকার জন দুই মাঝি জিনিসপত্র টানিয়া পাটাতনের উপর আনিয়া রাখিল। একটা চিকণ পাটি পাতিয়া দিয়া তাহার উপর মাথার গামছা দিয়া মুছিতে মুছিতে বুড়া মাঝি কহিতে লাগিল—কর্ত্তা অনেকদিন পরে দেশে আইছেন, এইবার আর আমাগো চিন্তা কি, পোলাপানে খাইয়া বাঁচব। মা ঠাকরুণরে যে লইয়াছেন ভালো করছেন।

কথা শুনিয়া চাটার্জ্জি সাহেব হতভম্ব হইয়া গেলেন। জীবনে যাহাকে কেহ কোন দিন সাহেব ছাড়া বলিতে সাহস করে নাই, আজ দেশের এইসব ছোটলোকেরা তাকে বলে কিনা কর্ত্তা। তাহার চোখদুটি রাগে ক্ষোভে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য মনাই কর সঙ্গে আসিয়াছিল, নীলা তাহার কাছে খুঁটিনাটি করিয়া গ্রামের সব কথা জানিয়া লইতেছিল। কেষ্টকুমার যে এবার প্রতিমা গড়িয়াছে, তাহা নাকি দেখিবার মত একটা—কিছু। চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন না করা পর্য্যন্ত নীলার ঔৎসুক্য একটুও কমিতে পারে না! সে বার বার মনাইয়ের কাছে ভালো করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইতেছিল। গীতা মনে মনে ভয় পাইল এই কথা শুনিয়া যে, সিংহের কেশর টানিয়া ধরিয়াছে অসুর ম'শায়, আর সিংহ তাহার হাতে কামড় দিয়াছে, ঝরঝর রক্ত পড়িতেছে।

চাটার্জ্জি সাহেব এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া একেবারে থ' খাইয়া গেলেন। নেহাত দায়ে পড়িয়া দেশে আসিয়াছেন, তার উপর কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী ও পাম্পসু পায়ে দিয়া চলাফেরা করিবার কথা ভাবিতেই মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল। উপায়ও নাই, জননী গৃহে আছেন, চোখ বুজিয়া সব সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই ভাবিয়া মনে মনে নিরস্ত হইলেন।

গ্রামে আসিয়া পৌছিতেই দলে দলে লোকজন নমস্কার জানাইয়া সরিয়া গেল। বৃদ্ধের দল আসিতেই জননী বারবার পায়ের ধূলি গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, না করা ছাড়া গতি নাই, নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহা করিতে হইল।

বাড়ীর ভিতরে আসিতেই একজন নগণ্য লোকের সাথে মুখোমুখি দেখা হইল। নগণ্য এই হিসাবে, তাহার গায়ে কোন জামা চাদর নাই, পায়ে জুতা নাই, না আছে পরণে পরিষ্কার কাপড়! নাম রামসুন্দর,

কর্ত্তাদের আমলের ভাণ্ডারী। আনত হইয়া প্রণাম করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, ভাইর বেটা দেশে আসছেন, কত আনন্দের কথা। আপনার বাবার সাথে একসাথে খেলাধূলো করছি, কত মারামারি, ঝগড়াঝাটি হইছে তার লেখাজোখা নাই। আপনাদের ভাত কাপড় খাইয়া-পইরা-ই আমরা মানুষ।

নীলার আনন্দের সীমা নাই। সে এতদিনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার মত মিলিয়াছে সখী, সাথী। টাট্‌কা ফল-মূল, তরি-তরকারী, মাছ, দুধ, খাওয়ার অপর্য্যাপ্ত জিনিস, জীবনে সে এত চোখে দেখে নাই। পুকুরে সাঁতার কাটিয়া এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিমা দেখিয়াই সে ব্যস্ত। চাটার্জ্জি সাহেবের খোঁজ খবর লইবার মত তাহার অবসর কোথায়। আর সহরের মত সর্ব্বক্ষণ কথা বলিবার সুযোগ এবং সুবিধা সহজে মেলে না। চাটার্জ্জি সাহেব গ্রামের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া আছেন,—নীলার সাথে হঠাৎ দুপুর বেলা ছাদে দেখা। খালি পায়ে আলতা রঙিন পা দু'খানি স্যাণ্ডেল হারা দেখিয়াই তাহার মেজাজ চড়িয়া যাইতেই কহিলেন, একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়েছ দেখছি। ভালো কাপড় চোপড় পরতে পারো নি?

নীলা প্রতিবাদের সুরে কহিল, এ গরীব দেশ, এখানে সব লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না; তার ওপর আবার এ বৎসর অজন্মা হয়েছে, তুমি তার কোন খোঁজ খবর রাখো। আর আমি এসে এখানে ফুলবাবু হয়ে সেজেগুজে বেড়াবো, সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমার লজ্জা করে না?

চাটার্জ্জি সাহেব আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, তা' যাদের ভালো কাপড় চোপড় আছে তারাও পরবে না, এ বড় অন্যায় কথা। তুমি জানো, মেয়েদের ভালো পোষাক পরিচ্ছদে দেখ্‌তে আমি খুব ভালোবাসি।

নীলা হাসিয়া কহিল, এ দশ বারো দিন না হয় নাই বা দেখলে। এবার চাটার্জ্জি সাহেব একটু রাগতভাবে কহিলেন, তুমি দিন দিন কেমন জানি হয়ে যাচ্ছ। ওকি, হাতের সব চুড়ি, গহনাপত্র কি করেছ?

—বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছি। আবার যাবার দিন পরে যাব।

—কেন, তার মানে?

—সে আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না!

সবারই পরণে লাল টকটকে পাড়ের শাড়ী—পরিষ্কার ধবধবে জর্জ্জেট, ক্রেপ, রেশমী শাড়ির বালাই নাই, হাতে দুই গাছি করিয়া শাঁখা, কপালে সিঁদুর। মুখ ভরা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। কথায় কথায় বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের বহর, মোটর গাড়ী, পাইক বরকন্দাজের বড় বড় কথা বলিয়া এখানে কেহ প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তোলে না। প্রাণখোলা হাসি, সাদাসিদা চালচলন, সাধারণ কথাবার্ত্তা, এ সব অনিলার দেখিতে শুনিতে বেশ ভালো লাগে।

দুপুরে সন্ধ্যাবেলা এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী বেড়াইয়া আসে। কত রকমের ফলমূল নারিকেলের সন্দেশ, মোঁয়া, নাড়ু পরম পরিতৃপ্তির সহিত সে সদ্ব্যবহার করে। এখানে টি-পার্টি নাই, তবে চা-পানের প্রচলিত প্রথা যে একেবারে নাই, সে কথা বলা চলে না। চা-সমিতির কৃপায় গ্রামের কৃষকেরা পর্য্যন্ত চা-পানের অভ্যাস স্থরু করিয়াছে।

নীলার দিদিকে পাইয়া যেন গাঁয়ের মেয়েরা হাতে আকাশ পাইয়াছে; অমন সুন্দর হাতের চুল বাঁধা, আদর যত্নের লোভ কেহই সহজে ছাড়িতে চায় না। এক বাক্স ভরা যে কয়খানি সুন্দর কাপড় সহর হইতে আনা হইয়াছিল, সব কয়খানি প্রায় সে বিলাইয়া দিয়াছে। স্বামী যে একটু অসন্তুষ্ট হইবেন সে কথা একবার ভাবিয়া আবার ভুলিয়া যাইত।

গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাহাকে পাইলে যে কত খুসী, সে কথা ভাবিয়া

অনিলা মনে মনে একটু পুলকগর্ব্ব অনুভব করে। ছেলে মেয়ের দল যখন দল বাঁধিয়া অনিলাদের ঘরেবাইরে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া বসে, অনিলা নিজের হাতে সে সব পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যায়। চাটার্জ্জি সাহেবের চেঁচামেচিতে বাড়ীর লোকজন আসিয়া একত্রে জড়ো হয়, বোধ করি ডাকাত বাড়ীতে পড়িলেও এত গোলমাল হয় না।

একদিন গাঙ্গুলী বাড়ীর একটি মেয়ে, নাম তার মালতী, আসিয়া কহিল,—দিদি, আমাদের বাড়ী যাবে একদিন বেড়াতে?

কেন যাবোনা ভাই, স্নিগ্ধ হাসিয়া অনিলা কহিল—আজ আমার সৌভাগ্য, আজ কার মুখ দেখে না জানি ঘুম থেকে উঠেছিলাম।

মালতী কৌতুক করিয়া কহিল, দাদাবাবুর মুখ দেখে নিশ্চয়ই…

—সে আর বলতে বোন, যা' বলেছ তুমি—বলিয়া গলাগলি হইয়া দুইজনে হাসিয়া কুটপাট হইল।

হাসি থামিলে পর মালতী কহিল, দাদাবাবুকে নিয়ে যাবে কিন্তু। ছোট বেলায় নাকি তোমাদের সতীশবাবুর সাথে কত জানাশোনা ছিল ওর। কত মারধর করেছে, কতদিন একসঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়েছে, কত ভাব ছিল ওর সাথে। উনি দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছেন, দেখা হয়নি নাকি, না বাড়ী ছিলেন না।

বিকেল বেলা চাটার্জ্জি সাহেবকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই অনিলা মালতীদের বাড়ি বেড়াইতে রওনা হইল। সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়, অষ্টমীর চাঁদ আকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পথে কোথাও আলোর বন্দোবস্ত নাই, জোনাকী-জ্বলা পথের দুই ধারে আম জাম সুপারির বাগ বাগিচা, শেয়ালের বসতি; দলে দলে লোকজন এই আলো আঁধারের মাঝখানে আন্দাজে ভর করিয়া পথ চলিয়াছে। পূজার ঢাকীদের ঢক্কা নিনাদে গ্রামখানি মুখরিত, কোন কোন চণ্ডীমণ্ডপে এইমাত্র

সন্ধ্যারতি সুরু হইয়াছে, তালে তালে নাচিয়া পাড়ার ছোট বড় ছেলের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে।

গাঙ্গুলী বাড়ীর কাছাকাছি একটি খালের উপর বাঁশের সাঁকো কোন মতে স্বামী স্ত্রী পার হইয়া গেল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভৃত্য ভজুয়া কিছুতেই এই অভিনব সাঁকোর উপর দিয়া পারাপার করিতে সাহসী হইল না।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া চাটার্জ্জি সাহেব দেখিলেন, জনকয়েক রসিক ছোকরা ধূপধূনা মাথায় নিয়া ধিনধিন করিয়া সারা আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইল। ইহাদের আগুনের ভয় নাই, সভ্যতার জ্ঞান কাণ্ড নাই···এই সব যুবকদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত দেখিয়া তিনি নিজেই মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সহসা তাহার চমক ভাঙিয়া গেল সতীশকে সুমুখে দেখিতে পাইয়া। সতীশকে তাহার মনে আছে, কিন্তু এখন তেমনভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। সতীশ তাড়াতাড়ি কহিল, ঘরে এসে বসো ভাই। বাইরে কেন?

চাটার্জ্জি সাহেব জবাব দিলেন—তা' এখানেই বেশ আছি, আবার ঘরে কেন?

মানে ঘরে একদল লোক বসিয়া হৈ চৈ সুরু করিয়াছিল, তিনি সেই সব আদৌ পছন্দ করেন না।

সতীশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা কি হয়। এস ভাই, এস! গ্রামে যখন এসেছ, তখন সহুরে ভাব একটু ছাড ভাই!

সতীশ যখন নাছোড়বান্দা, অনন্যোপায় হইয়া চাটার্জ্জি সাহেবকে ঘরে গিয়া বসিতে হইল, কিন্তু মনে মনে যত রাগ হইল অনিলার উপর। সে-ই তো তাহাকে এই বিপদে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।

তারপর সতীশের সাথে যত রকমের বাজে কথা দুনিয়ায় আছে

তাহাই স্থরু হইল। চাটার্জ্জি সাহেব 'হাঁ, না' বলিয়া কোন রকমে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অন্দর মহলে অনিলার কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া তিনি চুপ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামের ইংরেজী স্কুলের বৃদ্ধ রাইমোহন পণ্ডিতমহাশয় গলা ছাড়িয়া এমন উচ্চ কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছেন যে সেখানে আর বসিয়া থাকা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভিতর হইতে ডাক আসিতে সে যাত্রা কোন মতে বাঁচিয়া গেলেন। অন্দরে গিয়া দেশীপ্রথায় চাটার্জ্জি সাহেবকে দস্তুরমত চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় গলাধঃকরিয়া উঠিতে হইল। পূজার এই কয়দিন মিষ্টিমুখ না করিয়া কোন ভদ্রলোক পূজার বাড়ী হইতে যাইতে পারে না, সতীশ পূর্ব্ব হইতেই চাটার্জ্জি সাহেবকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছিল। তবু যেন কেমন কেমন তাহার আত্মসম্মানে বাধিতেছিল। তিনি এত বড় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, সাহেবস্থবোর হাত ধরিয়া বেড়ান, আগামী সম্রাটের জন্মদিনে খেতাব লাভের আশা আছে, আর জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা যুবকের দল, বৃদ্ধেরা, তাহার সাথে গা মাখামাখি করিতে সাহস পাইতেছে। এই সবের আরও প্রশ্রয় পাইতেছে নীলার দিদির কাছে।

ফেরার পথে মালতী খানিকটা দূর অবধি আসিয়াছিল। অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, আর একদিন আসবেন কিন্তু যাবার আগে। নীলা হাসিয়া সম্মতি দিতেই মালতী দীঘির পার হইতে হাসিমুখে ফিরিয়া গেল।

পথে পড়িয়া চাটার্জ্জি সাহেব রসিকতা করিয়া কহিলেন, ও—নীলা! তুমি সব জিনিসই বড় বাড়াবাড়ি করে তোল, এ আমার ভালো লাগে না।

নীলার দিদি চুপ করিরা থাকিবার পাত্রী নয়। ফস্ করিয়া জবাব দিল,—তুমি না এলেই পারতে, আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি আসি। তোমার ভালো না লাগে, তুমি এসো না।

চাটার্জ্জি সাহেব এবারের মত চুপ করিয়া গেলেন। সাধারণ লোক-জনের সাথে মেলামেশা করিতে তাহার সম্মানে আঘাত লাগে এ ধারণা তাহার বহুদিন হইতে ছিল। গ্রামে আসিয়া সে ধারণা তাহার আরও বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু নীলার দিদিকে চারি চক্ষের উপর পাড়ার ছেলে মেয়ে হইতে প্রৌঢ়া, বৃদ্ধারা যে স্নেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার মনে একটু খট্‌কা লাগিল এবং ধীরে ধীরে মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের আভাস লক্ষ্য করিয়া চাটার্জ্জি সাহেব নিজেই মনে মনে অবাক হইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়া আসিল। সেদিন নীলার দিদিদের ফিরিয়া যাইবার কথা। দুপুর হইতেই স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বৌ-ঝিদের আনাগোনায় নতুন বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলের মুখে সেই এক কথা—নীলার দিদি আজ চলিয়া যাইতেছে। সকলের সাথে হাসিমুখে অনিলা বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। চোখ দুটি অশ্রুতে টলমল করিতেছে, তথাপি উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া সে ঘোমটার আড়ালে সুন্দর মুখখানি ঢাকিয়া লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। পাড়ার ছোট খাট ছেলে মেয়েরা শাড়ির আঁচল ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিল, মনে মনে এই ভাব যেন ধরিয়া রাখিবে, আর কোথাও যাইতে দিবে না। তাহারা জানে এই তাহাদের নীলার দিদি; তাহাদের ভাই বোন, মা পিসী, মাসী সবাই ডাকে নীলার দিদি, এমন কি পাড়ার হাড়ী ডোম, মুচিরা পর্য্যন্ত—তাই ছেলেপেলেরাও নীলার দিদি নাম ধরিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে।

এমন সময় মরণ মাঝি নৌকা ঘাটে আনিয়া বাঁধিল। সর্ব্বত্র যেন একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। চাটার্জ্জি সাহেব বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার শোকাশ্রু বর্ষণের মাঝখানে

তাহার মনে পড়িল, বিজয়া দশমীর অব্যবহিত পরেই এই বিদায় দৃশ্য যেন সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে, নীলার দিদির আয়ত দুইটি চক্ষু যেন ছলছল করিতেছিল, হয়ত অকাল বাদল নামিয়া আসিবে; এমন সময় শত সহস্র সস্নেহ মমতাময় ও সুকোমল হস্তের অযাচিত আশীর্ব্বাদ তাহাব মাথার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অপরিসীম আনন্দে চাটার্জ্জি সাহেবের অন্তর মথিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে এক রোমাঞ্চের শিহরণ খেলিয়া গেল, তাঁহারও ইচ্ছা হইল ওই সমবেত নরনারীর সাথে প্রাণ মিশাইয়া তিনিও একবার স্বদেশের তরে এক ফোঁটা জল ফেলিয়া যান।

নৌকাখানি ঘাট ছাড়িয়া বহুদূর আসিলেও সকলেই একদৃষ্টে যতদূর দেখা যায় চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বিস্ময়ে, পুলকে চাটার্জ্জি সাহেবের সকল মান অভিমান জল হইয়া গেল। পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণপথে আরূঢ় হইতেই তাহার চক্ষু দুটি ক্রমাগত সজল হইয়া উঠিতে লাগিল।

"মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাব"

দৈনিক খবরের কাগজ না পড়িলে যাহাদের পেটের ভাত সহজে হজম হয় না, তাহাদের কাছে মোহনপুর গ্রামের কথা ভালো করিয়া না বলিলেও চলে বোধ করি। এই নগণ্য গ্রাম খানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় করিবার মত কিছু নাই।

ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, নদ-নদী, নালার বালাই নাই, গোটা কয়েক বেশ বড় বড় দীঘি, পুষ্করিণী কোন পুরাণ আমল হইতে বিরাজ করিতেছে কে জানে! গ্রামের চারিদিকে বড় বড় মাঠ, অদূরে লোকাল বোর্ডের রাস্তা, দূর হইতে তাল, সুপুরি, নারিকেল গাছের বাগ-বাগিচা দেখিলে সত্য সত্যই চক্ষু জুড়ায়।

একদিন যে গ্রামে সাতশ' ঘর হিন্দু-মুসলমানের বসবাস ছিল, আজ না হয় সেখানে পাঁচশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই বলিয়া গ্রাম তো আর একেবারে উঠিয়া যায় নাই, গাছ গাছড়া, বন বাগিচা, দীঘি, পুকুর, ভাঙা কোঠা-বাড়ি, বড় বড় টিনের ঘর, সবই পড়িয়া আছে। তবু গাঁয়ের লোকের দেশে যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে।

গ্রামে পা দিয়াই দেখি যে, সে গ্রাম আর সে নাই। এখন গ্রামে স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, হাট বাজার, ডাক্তার খানা, দস্তুর মত একটি ছোট খাট সহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চাষার ছেলেরা তামাক ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছে, বাড়ী-বাড়ী চা-পানের আসর, ঢঙী বাড়ী কলের গান, সেলাইয়ের কল, যুদ্ধের বাজারে ঘোষালদের আটচালায় একটি রেডিয়ো ইত্যাদি দেখিয়া মনে হইল, ভানুমতীর ভোজবাজীর মত রাতারাতি এ

গ্রামখানি সত্য সত্যই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সবই আছে, শুধু মানুষ নাই! একদণ্ড যে প্রাণ খুলিয়া কাহারও সাথে আলাপ পরিচয় করিব, এমন লোক নাই। যাহারা আছে, তাহারাও মানুষজন দেখিলে বাঘের মত ভয় করে। ইদানীং গ্রামে সৈন্য সামন্ত, সাহেব সুবো অনেক আসিয়া গেছে, তাই তাহারা প্রাণভয়ে তটস্থ হইয়া আছে।

বৃদ্ধদের মুখে শুনিলাম, এই নাকি ঘোর কলি। কলির শেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবিচার, অত্যাচার, মড়কের হিড়িকে দেশ ছাইয়া যাইবে, দেশে প্রচুর শস্য জন্মিবে না, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কবলে পড়িয়া অকালে কত লোক যে কালগ্রাসে পতিত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গুরুলঘু ভেদাভেদ থাকিবে না, সংসার একেবারে রসাতলে ডুবিয়া যাইবে, এমনি ধরণের সব কথা শুনিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়। প্রতিবারই যখন গ্রাম হইতে সহরে ফিরিয়া গিয়াছি, তখন আর গ্রামে যাইতে সাধ জাগে নাই। নিবিড় বনজঙ্গলে ঘেরা ঘর বাড়ী, মেঠো পথ, বাঁশঝাড়, ম্যালেরিয়া, পচা নালা ডোবা, শেয়ালের হুক্কাহুয়া, ডোবা, মজা দীঘির বুকে হলদে পানা, কচুরি পানা, সাপ খোপের ভয়, কত দুঃখ, কত দারিদ্র্য, তবু গ্রামের কথা ভুলিয়া থাকা যায় না, কি যে যাদু আছে, কে জানে!

শীতের প্রভাত। পুকুর পাড়ে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলাম। সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে পাড়ার প্রবীণ শম্ভু চাটুয্যে, দেবেন্দ্র ঘোষাল, শিবু খুড়ো, রাজকুমার পণ্ডিত, রাইমোহন মাষ্টার, আরও কত-কে ঠিক মনে নাই। কাহারও গায়ে একখানি পুরাণো কাঁথা, কেহ একখানি জীর্ণশীর্ণ বালাপোষ, কেহ একখানি সস্তা জাপানী কম্বল গায়ে জড়াইয়া রৌদ্রে লাল হইয়া উঠিয়াছেন। একটুখানি দূরে কুলগাছের নীচে প্রকাণ্ড এক ছেলেমেয়েদের জটলা বসিয়াছে। সকলেই উদগ্রীব দৃষ্টিতে গাছের উপরে ছোট ছোট পাখীদের গতিবিধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল,

কখন দু' একটী পাকা, ডাঁসা কুল তাহাদের ঠোঁটের মৃদুস্পর্শে বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে। এক গাদা বাসন মাজিতে মাজিতে ঘোষালদের বড় বউ ঘোমটার ফাঁকে সে দৃশ্য দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। এমন সময় পুকুরের ওপার হইতে বাল্যবন্ধু ষোড়শী চৌধুরীর আবির্ভাবে হঠাৎ চমকিত হইয়া কহিলাম, কি হে দধিরাম, খবর কি ?

দধিরাম ওরফে ষোড়শী চৌধুরী পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, খবর সব ভালো। গ্রামের কুশল।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে আমাকে এক রকম জোর করিয়াই গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমারও ইচ্ছা ছিল, একদিন গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিব, দধিরামকে সঙ্গে পাওয়ায় সে সুযোগ মন্দ মিলিল না। নয়াবাড়ীর পথে ঘোষালদের আম বাগানের পথ ধরিয়া গ্রামের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে চলিলাম। কালীবাড়ীর কাছে আসিয়াছি, এমন সময় দধিরাম ফস করিয়া কহিল, আঃ, রামঃ, যে কাজে এসেছিলাম, আসল কথা বলতেই ভুলে গেছি।

বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল মিশ্রিত চাপা হাসিতে তাহার মুখখানি সহসা রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। ব্যাপার কি কিছুই কূলকিনারা করিতে না পারিয়া কহিলাম, বলনা ভাই, কি হয়েছে।

—"মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাবের" সভ্য হ'তে হবে তোমাকে,—বলিয়াই সে চাঁদার রসিদ বইখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিল।

অবাক হইয়া কহিলাম, "মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাব", সে আবার কবে হ'ল ?

—আজ দু' বছর। গেল বছর বারোয়ারী পূজায় "সাজাহান" অভিনয়

হয়েছিল, আর এবার হচ্ছে "কেদার রায়",……গাম্ভীর্য্যের সহিত একটু হাসিয়া দধিরাম কহিল, সিন, ড্রেস, সবই নূতন কেনা হয়েছে, হার্মোনিয়াম, অর্গান, ডান-বাঁয়া, সবই আছে। আমাদের কিসের অভাব তোমরা থাকতে!

পুলকিত হইয়া কহিলাম, কার্ভালোর পাট কে করবে ভাই? বড় শক্ত কিন্তু!

দধিরাম গোঁফে চাড়া দিয়া কহিল, "ললিত দি গ্রেট।" বঙ্কুর ভাইকে মনে আছে তো?

—বেশ আছে।

—বঙ্কু এখন নড়িয়ার দারোগা। গেলবার পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে গেছে।

হাসিয়া কহিলাম, দারোগার ভাই অগাধ টাকা, আমিও কিছু দেব, তবে পাঁচ দশ টাকার আশা করো না কিন্তু!

কথায় কথায় প্রায় গাঙ্গুলী বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় দেখি পাড়ার টেবু ঘোষাল চুপি চুপি গাঙ্গুলীদের বাঁশঝাড় হইতে গোটা কয়েক পাকা বাঁশ বেমালুম কাটিয়া গাফ মারিতেছে।

দধিরাম হাঁকডাক করিয়া কহিল, টেবু ঘোষাল, দিনে দুপুরে এ কি ডাকাতি করছ! বলিয়াই চোখ দুটি কপালে উঠাইয়া কানে হাত দিয়া দধিরাম পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল, ও অতসীর মা, খুড়ীমা, আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল, বাঁশ ঝাড়ের………

টেবু ঘোষাল তাড়াতাড়ি চোখ পাকাইয়া কহিল, কাল যে তোমরা থিয়েটারের জন্য ঝাড় শুদ্ধ বাঁশ সাফ করে নিয়ে গেলে, আর আমি আজ দু'টো বাঁশ কেটেছি তো বড় চক্ষুশূল হয়েছে তোমার,…না? খুড়ী আজ ভিন গাঁয়ে গিয়েছে,…আচ্ছা মনে রেখো।

অনেক ডাকাডাকির পরও যখন খুড়ীমা আসিলেন না, দধিরাম সুর নামাইয়া কহিল, আচ্ছা আজ নিয়ে যাও, আর কখনও এ পাড়ায় এসো কি বাঁশঝাড়ে হাত দাও, তা'হলে আর রক্ষা থাকবে না!

টেবু ঘোষাল মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, শালা চাঁদা নিতে এসো, দেখা যাবে'খন। তোমাকে আবার চিনি না, শক্তের ভক্ত, নরমের যম তুমি!

দধিরাম আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, দেখছো ভাই দেশের লোকের কাণ্ডকারখানা, দিনে দুপুরে ডাকাতি!

টেবু ঘোষাল তখন কাছাকাছি আসিয়া কহিল, ষোড়শী চৌধুরী, ছোট মুখে বড় কথা কয়ো না! বালিকা বিদ্যালয়ের নাম করে কত টাকা পয়সা পেয়েছ, এখন আবার থিয়েটারের ভড়ং করে এর পিছু জুটেছ বুঝি! সাবধান, একটি পয়সা দিয়েও দধিশর্ম্মাকে বিশ্বাস করোনা যেন! গাঁয়ের লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে বাবাজী! পুলিশের হাত ধরা লোক কিনা, তাই ডরে ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। আমি জানকী ঘোষালের ছেলে, আমার অত ডর ভয় নেই, তিন তিন বার গান্ধীর কল্যাণে জেল খেটে এসেছি। তোমার মত তিন দধিরামকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তে পারি।

দধিরাম বাধা দিয়া বিষম রাগিয়া উঠিয়া কহিল, দেশের কুলাঙ্গার, ঘোষাল বংশের কুষ্মাণ্ড কোথাকার, লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আবার ভ্যা ভ্যা করে কথা বলা হচ্ছে। হাতে-নাতে ধরা পড়েও লজ্জা হয়নি তোমার। হ্যাঁ, থাকত আজ রমণী সামন্ত, আর তারক আচার্য্যের মত স্কুল মাষ্টার, কাণে ধরে কবে স্কুল থেকে বের করে দিত কিনা বোঝা যেত। বুঝলে ভাই, উনি তোমাদের পাঠশালার একজন মাষ্টার।

টেবু ঘোষালও ততোধিক উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করিয়া কহিল, কোন

শালা আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দিতে পারে, দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা,……যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !

একটা হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোন মতে দধিরামকে নিরস্ত করিয়া টানিয়া লইয়া কহিলাম, চল ভাই চলো, ও সব বাজে কথায় কাণ দাও কেন ? দেশের কাজ করছ, করে যাও। ভয় কিসের ; তারপর তোমার ড্রামেটিক ক্লাবের অভিনয় কবে হচ্ছে বলো দেখি।

দধিরামের রাগ দেখি পড়িয়াও পড়িতে চায় না। সারাপথ সে শুধু বক্ বক্ করিয়া ঘোষাল অবতংসের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করিতে করিতে পথ চলিয়াছিল। কোন মতে বেলা দুপুর অবধি এই ভবঘুরের সাথে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিনও গ্রামে বাহির হইয়াছিলাম, এমনি প্রতিদিনই যাই। আর একদিন সকালে বাহির হইয়াছি, ষোড়শী ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, রোববার "কেদার রায়" হবে, গাঙ্গুলী বাড়ী, যেয়ো কিন্তু !

—নিশ্চয়ই যাবো।

—আর চাঁদার কথা,…ভুলোনা যেন !

—না, না, ভুলবো কেন, কালই পাঠিয়ে দেব। তোমরা গ্রামে থিয়েটার করছ, আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত, ইত্যাদি ! স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া বৃহৎ একটি সাঁকোর উপর পা ফেলিয়া খালের ওপারে গাঁয়ের হাটের পথে যাইতেছিলাম।

পথে যত ছেলে ছোকরাদের সাথে দেখা হইয়াছে, সকলেরই মুখে ঐ এক কথা,…"কেদার রায়…মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাব", এমন কি কে কে কোন পার্ট অভিনয় করিবে তাহা পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে তাহাদের।

হাটে গিয়া শুনি থিয়েটারের জল্পনায় কল্পনায় ছেলে-বুড়ো-মেয়ে

মহলে হৈ হৈ পড়িয়াছে। শম্ভু চাটুয্যের ওজন-হরির-লুট কাল হওয়ার কথা, দেড়মণ বাতাসা মাপিতে গিয়া ভগা ব্যাপারী বিষম হাঁপাইতেছিল। এক সাথে এতগুলি বাতাসা চোখে দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই, তাই একেবারে তাক্ লাগিয়া গেল। গ্রামে গুজব শুনিলাম, দ্বিতীয় পক্ষের মানত ছিল, তাই শম্ভু চাটুয্যে ওজন-হরির লুটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তিননাথের মেলা, নারায়ণ-সেবা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, কোন কিছুরই বাদ নাই।

দোকানে ঢুকিয়া দেখি একজন বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, দাড়ি গোঁফে সারা মুখে আগাছার মত একেবারে ভর্ত্তি, ক্ষৌরকারের সাথে নয়-ছ'মাস যে তাহার দেখা হইয়াছে মনে হয় না। কাপড-চোপড দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, গ্রামে ধোপা-নাপিত বুঝি বন্ধ। সর্ব্বাঙ্গে চিতা-বাঘের মত ক্ষত বিক্ষত কোন ব্যাধির চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্ত্তমান, সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কবে এসেছ দেশে, ভালো ত ?

হঠাৎ তাহার কুশল প্রশ্নে আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলাইয়া কহিলাম, দিন কয়েক হ'ল এসেছি, ভালোই আছি।

সেই লোকটি অবিচলিত স্বরে কহিল, আমায় তুমি চিনতে পারোনি বাবা, আমি বল্লভ ডাক্তার···

চমকিয়া কহিলাম, বল্লভ ডাক্তার বাবু, আপনার এ দশা,···যার দালান, বালাখানা, দাসদাসী, টাকা পয়সা, ছেলে মেয়ে,···আজ তাহার এই অবস্থা !

কথাটি সময়োচিত নয় ভাবিয়া মনাই চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে কহিলেন, ছেলেটি মারা যাবার পর থেকেই এই অবস্থা। সকলই তাঁর ইচ্ছা।

—তাঁর ইচ্ছা ত বটেই !

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলাম। মনে হইল;

কালীর বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপে একবার উঁকি মারিয়া যাই। সেখানে রাত্রি দিন নাই, পাড়ার অকেজো ছেলেদের থিয়েটারের মহলা চলিতেছে। খানিক দূর অগ্রসর হইতেই থিয়েটারের আরও সোরগোল শোনা যাইতে লাগিল। গিয়া দেখি, নিশি ধোপা কয়েকটি বাগদী পাড়ার ছেলেকে প্রাচ্য নৃত্যের মত কি একটা থিয়েটারী ঢঙের নাচ শিখাইতেছে। ইন্দু মল্লিক, অবনী ঘোষাল, সীতা ব্যাপারী, স্বয়ং সম্পাদক দধিরাম পর্য্যন্ত বিকট চীৎকার করিয়া পার্ট বলিতেছিল, আমাকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল। বিদেশ হইতে আগত একটি ছেলে গানের সুর দিতেছিল। তাহার গলা নেহাত মন্দ না, চলনসই নিশ্চয়ই! অন্ততঃ আমি যে পাহাড়ে থাকি, সেখানে এমন ধরণের গাইয়ে-বাজিয়ে দু' একজন ছাড়া বেশী নাই। পাহাড় হইলেও সহর বটে, আর এ যে গণ্ডগ্রাম!

দধিরামের কাছে শুনিলাম, এই ছেলেটি নাকি সোণামণির পার্ট বলিবে। বেশ মিহি মেয়েলি গলা, চেহারাটাও নিতান্ত খারাপ নয়, রঙ ফর্সা, পাউডার না মাখিলেও চলিবে।

আরো শুনিলাম, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাখম মুখুয্যে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে সর্ব্বদাই প্লে করিয়া থাকে, এবং সেই হিসেবে এই ছেলেটিও শিশির ভাদুড়ী হইতে কৃষ্ণধনের হাবভাব, মোশন, কথাবলার ভঙ্গী, সব কিছু একেবারে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটির নাম ননীগোপাল, কলিকাতায় সহরতলীতে মামার বাসায় থাকিয়া অন্নধ্বংস করে এবং মামা-মামীর শত সহস্র ফুট-ফরমাস জোগাইয়া বিনি পয়সায় থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখে। তাহার মামা যতীনবাবু পুলিস অফিসার এবং আমি কলিকাতা কোন সময় গেলে সে আমাকে অনায়াসে এই সব দ্রষ্টব্যগুলি "পাশে" দেখাইয়া দিতে পারে, এই সব কথা এতদ্‌সঙ্গে বলিতে ভুলিল না।

তাহার সাথে আলাপ পরিচয় করিয়া দেখিলাম, সহরে থাকিয়া সে বেশ আদবকায়দা শিখিয়াছে। গ্রামের ছেলেদের মত ততটা অপ্রতিভ নয়। কথায় কথায় সে বলিতে লাগিল, অনীতা বসুর নাম শুনেছেন কি! অনীতা বসুর সাথে তাহার আলাপ পরিচয় আছে, অনাদি বাবু তাহার হাতধরা লোক, শ্যামবাবু, হারুবাবু বন্ধু, কাননবালা, লীলা দেশাই কেহই তাহার অপরিচিতা নয়। ইদানীং দেশের মায়া ছবিখানি আসিয়াছে। লীলা দেশাইর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, লীলাদের সাথে কতবার আমি কাসিয়াং বেড়াতে গিয়েছি, এই দেখুন তার ফটো। বলিয়া সে সত্যসত্যই একখানি ফটো পকেট হইতে বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল। তবে লীলা দেশাইয়ের ফটো কি না সঠিক বলিতে পারিলাম না।

ননীগোপালের ভাবগতিক দেখিয়া চুপ হইয়া গেলাম। মনে মনে কহিলাম, ইহারা কথায় কথায় লীলা দেশাই, জ্যোৎস্না গুপ্তা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, আর আমরা একটি লোকের নাম ধাম, আলাপ পরিচয়ের কথা পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিনা। পাড়ার ঘোষদাদা বলেন, হায়রে দেশে যখন প্রগতির সূত্রপাত হইল, সহশিক্ষার যুগ আসিল, আমাদের যৌবন তখন একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে দেখি। এমন অসময়েও পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম!

এই পরম তৃপ্তিকর দুঃখের চিন্তাতেও আরাম আছে! কর্ম্মের অবসরে এই সব রোমান্সের কথা, ছাই-পাশ কথায়ও বেশ সময় কাটিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত ননীগোপাল আমাকে একটা ভাটিয়ালী গান গাহিয়া শোনাইয়া ছাড়িল।

যাইবার পথে শুনিয়া গেলাম, কেদার রায়ের যিনি অভিনয় করিবেন, তাহার সমকক্ষ অভিনেতা এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি নাই। তিনি সৈন্ধ

ঘোষের শ্রীতারক ভট্টাচার্য্য। থিয়েটার করিয়া কত যে সোনা রূপার পদক তিনি পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দধিরাম জোর করিয়া বলিল, এক তারক ভট্টাচার্য্যই একা 'একশ', তাহার অভিনয়ে আসর একেবারে মাত হইয়া যাইবে।

বায়োস্কোপের কল্যাণে বহুদিন থিয়েটার, যাত্রা দেখি নাই। এক সময়ে এ সব আমোদ প্রমোদে বেশ ঝোঁক ছিল। শিলং পাহাড়ে নারায়ণ ডাক্তারের আব্‌দালা, এবং শৈলেশ বাবুর সাকিনা বিবির অভিনয় দেখিয়া ছোট বেলায় মনে হইত, এমন চমৎকার অভিনয় বুঝি আর কখনও দেখিব না! এবং আর কেহ করিতে পারে না। যেবার কলেজে পড়িতে আসিয়া ষ্টার থিয়েটার দেখিলাম, তখন সে সব ধারণা যে কোথায় উড়িয়া গেল, ভাবিয়া কূল পাইলাম না! এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিনয় না হইলে মন উঠে না, কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।

বেলা যে কয়টা বাজিয়াছিল, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সূর্য্য কিন্তু মাথার উপর ছিল। এমন রাস্তা ঘাট, আমজাম কাঁটালের শাখা প্রশাখায়, বেতস ঝোপে, বাঁশঝাড়ের সন্নিকটবর্ত্তী বিক্ষিপ্ত গাছ গাছড়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আছে। কচুরি-পানা পচার গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত, সুরুৎ করিয়া কি একটা সরীসৃপ প্রাণী পায়ের কাছে হিড় হিড় করিয়া ছুটিয়া গেল! মান্নু করের পোড়ো ভিটায় একটা শৃগাল এই দিনের বেলায়ই বসিয়াছিল, করের বাড়ীর কালো কুকুরটা হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাড়া করিয়া গেল! সারা দেহ যেন ছম ছম করিতে লাগিল।

খানিকটা আগাইয়া আসিয়া দেখি পাড়ার হরিধনের পিসী একাকী চলিয়াছেন, পিসীর পিছু ধরিয়া কোন মতে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

দিনের বেলা কোন রকমে কাটিয়া যায়, রাত্রিবেলা আর যেন কাটিতে চাহে না। সন্ধ্যা হইতেই ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর

কোন উপায় নাই। সন্ধ্যা রাত্রিতে ছেলেপেলেদের কোলাহলে বাড়ীখানি জাগিয়া থাকে। একটু রাত্রি গভীর হইলেই তাহাদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। একদিকে ভুতুম পাখীর বিশ্রী ডাক, লক্ষ্মীপেঁচার 'কু কু' শব্দ, বিরাট নিস্তব্ধতা এইসব মিলিয়া মিশিয়া যেন এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জানালা খুলিয়া শোওয়ার উপায় নাই, চোর ডাকাতের ভয়, অন্ধকার রাত্রি হইলেই তাহারা নিশাচরের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। 'খাটাস্' নামক এক জন্তু ঘরের কোণে আসিয়া এমন বিশ্রী শব্দ করিতে থাকে যে বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠে। ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, বাতাস ধীরে বহিতে থাকে, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, ঠিক জানিতে পারি নাই! শেষ রাত্রিতে টুপটাপ করিয়া শিশির পড়িতে থাকে, শুকতারা দপ্‌দপ্ করিয়া না জ্বলিয়া উঠিতেই কত রকমের পাখী যে গান স্বরু করিয়া দেয়, শীতের রাত্রিতে লেপমুড়ি দিয়া বিছানায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে যে কী আনন্দ লাগে, তাহার বর্ণনা ভাষায় নাই। ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ ভালো বুঝিবেন কিনা সন্দেহ।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশ যখন ফর্সা হইয়া ওঠে, মানিক মাঝি খেজুর গাছে উঠিয়া রসের হাঁড়ি নামাইতে থাকে। পাড়ার বউ ঝি, বৃদ্ধারা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়েন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কুল গাছের নীচে ছুটাছুটি স্বরু করিয়া দেয়। এমনি ভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়।

সেদিন ভোর না হইতেই কালীর বাড়ী লোকে-মজুরে সরগরম হইয়া উঠিল! সামিয়ানা খাটাইতে হইবে, তাহার নীচে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিবার আসনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরের এক তৃতীয়াংশ জায়গা চিক দিয়া ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে ভদ্র মহিলাদের জন্য। সিন,

ড্রপ, সাজসজ্জা ভিনগাঁ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গ্রামেও কম নাই। কেদার রায় অভিনয়ে অনেক জিনিষ পত্রের প্রয়োজন, এ কথা সেক্রেটারী বাবু দধিরাম আগন্তুকদিগকে বার বার জানাইয়া দিতেছিল। একটি কাগজের জাহাজ পর্য্যন্ত তৈয়ার হইয়াছে !

নিশি ধোপা মোসন মাষ্টার, ড্রামেটিক ক্লাবের জন্য তিনশতাধিক খিলিপান দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তামাকের ভার নিয়াছে লীগের মৈজদ্দি মোল্লা। হাটে তাহার প্রকাণ্ড তামাকের আড়ত আছে! চাঁদা এক টাকা নগদ এবং যাবতীয় তামাকের সাজ সরঞ্জাম সে শুধু যোগাইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মন কষাকষি নাই, কোন কালে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। দুর্গাপূজায় বৃদ্ধেরা দাড়ি নাড়িয়া আরতির সময় হিন্দুদের টিকি নাড়ার সাথে জগাই ঢুলির ঢোল ঢাকের অপূর্ব্ব বাদনের সহযোগে নৃত্য করিয়া থাকে, ইহাও সময় সময় দেখা গিয়াছে, এবং ওপুড় হইয়া সাশ্রুনেত্রে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে ভক্তি প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। তাহারা চাহিয়া শুধু পান তামাক খায় না, অন্যান্য প্রসাদ পাইলেও কম খুশী হয়না কিন্তু। যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম,— বিড়ি সিগারেট, চায়ের ব্যয় মোহনপুর ড্রামেটিক ক্লাবই বহন করিবে। তবে চৌধুরী বাড়ীর মেয়েরা ক্লাবের সভ্যদের জন্য পাটালিগুড়ের সন্দেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা দধিরাম সকলের কাছে অকাতরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুপুর বেলা দলে দলে লোক আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল। বাঁধা ছাঁদা সব একেবারে কমপ্লিট। কালীর বাড়ীর চেহারাই যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

মেয়েরা অপরাহ্ণ হইতেই রান্না বান্না শেষ করিতেছেন। সন্ধ্যা রাত্রিতে না গেলে আবার সুবিধামত বসিবার জায়গা পাওয়া যাইবে না।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পরিত্রানে দুপুর হইতেই ঘুমাইতে ছিল, কেহ তাহাদের আর ডাকিতেছে না, কারণ আজ রাত্রি জাগিতে হইবে। মেয়েরা কেহ বলিতেছে, কেদার রায় যে বড প্লে, হয়ত রাত্রি ভোর হইয়াই যাইবে। কেহ বলিল, অত হবে নারে, রাত্রি তিনটে অবধি হবে। রাত্রি যাহাই হোক না কেন, থিয়েটার শেষ না করিয়া কেহ বাড়ী ফিরিবে না, এ কথা নিশ্চিত।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই শিরোমণি মশায় সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া আসিলেন। ছেলেমেয়েরা তখন কাপড চোপড় পরিতেছিল। ঘোষালদের ছোট বউ রাণী সহরের মেয়ে, পূজায় বাড়ী আসিয়াছে। কেমন করিয়া সাজগোজ করিতে হয় সে ভালো জানে। হাজার হোক দশ পাঁচটা ত সে চোখে দেখিয়াছে। সুন্দরী বলিয়া রাণীর গাঁয়ে একটু নামও ছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কয়েকখানা হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার, পরনে ঘরবাড়ী ছবি-আঁকা পাড়ের শাডী, কপালে সিঁদূরের ফোঁটা, দেখা ভালো যায় কি যায় না। ঠোঁটে লাল রঙ, মুখে 'লাবণি', সর্ব্বাঙ্গে "কাস্তার" সুরভিতে ভরপূর। পায়ে এক জোড়া ফ্যান্সি স্যাণ্ডেল, আসরে আসিয়া বসিতেই গাঁয়ের মেয়েরা একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল! ঘোষালদের রমা সাধারণ একখানি ডুরে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। হাতে চারগাছি সোণার চুড়ি, গলায় হার, কাণে রূপার দুল। দেহের রঙ যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়, মুখশ্রী রাণীর চেয়ে ঢের সুন্দর। গরীবের মেয়ে বলিয়া কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতে ছিল না।

আরও বউ-ঝি-বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া রমণীদের সমাগমে মেয়েদের বসিবার স্থান গমগম করিতে লাগিল। কেহ পানের বাটা, জাঁতি, সুপুরি, মশলা ইত্যাদি নিয়া আসিয়াছেন, সদ্য প্রসূতারা দুধের বাটি, রূপার ঝিনুক, ছোট স্পিরিট ল্যাম্পের বোঝা বহিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ছকির পিসী, হরির

মাসী, নন্দলালের বিধবা ভগিনী এবং অন্যান্য প্রাচীন বৃদ্ধারা এই প্রচণ্ড শীতে মোটা কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিলেন, এবং কম্বলের নীচে প্রত্যেকের হাতেই এক একটি তুঁষের আগুনের পাতিল, দিব্য আরামে তাহারা আগুন তাতিয়া কান পাতিয়া হালের মেয়েদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। সেখানে আলোচনা হইতেছিল না, এমন বিষয় নাই। পাড়ার কোন গাছে কয়টা নোনা ফল ধরিয়াছে হইতে সুরু করিয়া রবি ঠাকুরের কথা, মহাত্মা গান্ধীকে কলিকাতায় কে কতবার দেখিয়াছে, কেদার রায় থিয়েটারে কে সব চেয়ে বেশী ভালো পার্ট বলিতে পারিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি! চৌধুরীদের মেয়ে চপলা খদ্দরের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, রায় সাহেবের ভগ্নিপতির মাসতুত বোন তাহাকে শাসাইতে লাগিলেন এই বলিয়া যে, তাহার স্বামী পোর্ট কমিশনার অফিসে যখন কাজ করে, তবে কেন সে খদ্দর পরিয়া পুলিশের নেকনজরে পড়িতে চায়। চপলা বিরক্তির সুরে জবাব দিল, খদ্দর না পরিলে আজ কালের দিনে ভদ্দর লোক হওয়া যায় না, সাহেবরা পর্য্যন্ত আজকালের দিনে খদ্দর পরিয়া থাকেন।

পদ্মপিসী চশমার ফাঁকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকাল কি সাহেব মেমরা কাপড পরে নাকি কোলকাতায়। তবে যে আমাদের গ্রামে যাঁরা আসে, তাদের পরণে সাহেবের পোষাক কেন!

কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাণী তাড়াতাড়ি কহিল, না পিসিমা, তারা কাপড় পরবে কেন? তবে মেমরা সখ করে শাড়ী পরেন মাঝে মাঝে শুনি।

পদ্মপিসী সকল কথা শুনিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, তা হবে, তোদের মুখেই এ সব কথা শুনি। আমরা কি আর ওসব দেখেছি বা কারও কাছে শুনেছি।

এমন সময় বাহিরে সোরগোল উঠিল, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব আসিয়াছেন। কেহ বা ঝুঁকিয়া দেখিল, কেহ তেমন লক্ষ্য করিল না। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড আসর লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে! শিরোমণি মহাশয় নামাবলীর উপরে সুপ্রাচীন বালাপোষ জড়াইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতেছেন, ভগবান-দাদা দু'কুড়ি খুড়ো, কালী জ্যেঠা, ঘোষাল বাবুরা, ছেলে মেয়ে, ইতর ভদ্র গাঁয়ের যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়াছে। শুধু মোহনপুর গ্রামের নয়, আশে পাশে, সুদূর ভিনগাঁ হইতে যে খবর শুনিয়াছে দল বাঁধিয়া মশাল জ্বালিয়া সন্ধ্যা রাত্রিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। মৈজদ্দী মোল্লা, কালু সেখ শুধু একা আসে নাই, দলবল লইয়া কোণায়, কিনারায় যেখানে একটু স্থান দেখা গিয়াছে, সেখানেই পাথরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, একবার উঠিলে আর সেখানে আসিয়া বসা অসম্ভব।

দুর্গামোহন কাকার মন খারাপ, কোনদিন আমোদ প্রমোদে যোগ দেন না। গতকল্য দধিরাম জলজ্যান্ত দু'টি নগদ টাকা চাঁদা লইয়া আসিয়াছে, টাকার শোকে তিনিও থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন, জনসমুদ্র দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। শিরোমণি মশায় ভক্তচূড়ামণিকে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বিকট চীৎকার করিয়া কহিলেন, ওরে বাবা দধি, কাকা যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন! ও বাবা ভলান্টিয়ার বাবুরা···ও ইয়ার-কি (A. R. P.) বাবুরা···

শিরোমণি মশায়ের কথা শেষ না হইতেই দেখা গেল, একদল স্বেচ্ছাসেবক দুর্গামোহন কাকাকে চ্যাঙদোলা করিয়া আসরের মাঝখানে নিয়া যাইতেছে। এমনি আর কত গণ্ডগোল সুরু হইল। বৃহৎ ব্যাপারে দোষ ত্রুটি চিরদিনই একআধটু থাকিয়া যায়।

রাত্রি তখন প্রহরাতীত। কোন মতে একটু স্থান লাভ করিয়া আসরে বসিয়া হিহি করিয়া শীতে কাঁপিতেছিলাম। চারিদিক এক রকম খোলা বলিলেই হয়, মাঝে মাঝে বাতাস বহিতেছে, অত্যুজ্জ্বল "হেজাক্" ল্যাম্পের তীব্র আলোকে চাহিয়া দেখিলাম, মাঝখানে পদ্মফুল আঁকা বিশাল সামিয়ানা শিশিরে ভিজিয়া একশা হইয়া গেছে। আর যে কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে, ভগবানই জানেন। ভিতরে সাজ পোষাকের মহলা চলিয়াছে। বয়স্ক ছেলেরা দাড়ি গোঁফ কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজিবার জন্য মুখে চূণ কালি মাখিতেছিল, দুষ্টু ছেলেরা তাহা উঁকি মারিয়া দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে। দধিরামের চোখে বার কয়েক পড়িয়া অসহ্য ধমক, শাসানি খাইয়াও তাহাদের চৈতন্য লাভ হয় নাই।

এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক এক ডালা পানের খিলি লইয়া উপস্থিত হইতেই একদল ছেলে যেন ডালার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। চেঁচা-চেঁচি, মারামারি, হুড়াহুড়ি করিয়া ছেলেটিকে আর বাটিয়া দিবার অবসর দিল না। বেগতিক দেখিয়া যে যাহা পাইল, কাড়িয়া লইল, ছেলেটি রণে ভঙ্গ দিয়া 'চাচা, আপন পরাণ বাঁচার' মূল নীতি অনুসরণ করিয়া পলায়ন করিল।

রাত্রি নয়টা বাজিতেই ঠঙ্ করিয়া প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই ঐক্যতান বাদন সুরু হইল। বাজ্‌না নেহাত মন্দ নয়, ছেলেপেলেদের কোলাহল, ঘন ঘন করতালিতে কিছুই ভালো শোনা যাইতেছিল না। কেহ কেহ বা জোরে শীস্ দিতে সুরু করিয়া দিল। এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। অজস্র কোলাহলের এবং চেঁচা-চেঁচির ভিতর প্রাচীনেরা অনেকেই দধিরামের খোঁজখবর করিতে লাগিলেন। ড্রপ উঠিতে আর কত বাকী। তাঁহারাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া দধিরামকে

গালাগালি সুরু করিয়াছিলেন। কোথায় দধিরাম আর তার সাঙ্গো পাঙ্গরাই বা কি করিতেছে এতক্ষণ বসিয়া। এই শীতের রাত্রিতে···

কে-একজন আসিয়া খবর দিল, দধিরাম মুখে চূণকালি মাখিয়া রাজার পোষাক পরিতেছে, অমনি সভায় হাসির লহর খেলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ঐক্যতান বাদনও হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে, অথচ দ্বিতীয় ঘণ্টাও পড়িতেছে না, ড্রপ শুধু বাতাসে নড়িতেছে মাত্র। একটি ছেলে স্মুখে বসিয়াছিল, সে চেঁচাইয়া কহিল, ড্রপ উঠিতেছে।

সকলেরই কৌতূহল দৃষ্টি সেদিকে পতিত হইল, এমন সময় মৈজদ্দি মোল্লা দাড়ি গোঁফ সমেত মুখখানি ড্রপসিনের এক কোণ হইতে বাহির করিয়া কহিল, আজ্ঞে, কর্ত্তারা ত ভিতরে কেহই নাই।

স্মুখের ছেলেমেয়েরা কেদার রায় আসিয়াছে বলিয়া ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। মৈজদ্দি মোল্লা লুঙ্গী পরিয়া বাহিরে আসিল, এবং আবার সে সেই কথা পুনরায় কহিতেই ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। বৃদ্ধ এবং যুবকেরা অসহ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি সুরু করিয়া দিল। জন কয়েক সদ্যঃ আন্দামান ফেরত তরুণেরা লোকজনকে ধরিয়া বসাইল। লোকজন উন্মত্ত হইয়া ড্রপ ইত্যাদি ছিঁড়িয়া ফেলিবে ভাবিয়াছিল। একজন তরুণ তাড়াতাড়ি ড্রপসিন টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল। চারিদিকে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কাহাকে পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বৃদ্ধেরাও আগাইয়া আসিলেন। কোথায় দধিরাম শর্ম্মা আর তাহার দলবল। ষ্টেজের পিছন দিকে প্রকাণ্ড এক আম বাগিচা ছিল, সেই পথে, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই সকলে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেন সকলে এরূপভাবে চলিয়া গেল, এ বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা সুরু হইল। এমন সময় পচা ঘোষাল ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির। তাহার হাতে একটা ডিজের

লণ্ঠন। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, থিয়েটার হবে কি শিরোমণি-মশায়। তারক ভটচায্যি এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে যে, আজই কলিকাতা থেকে তার শ্যালিকার বিয়ের খবর পেয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে, একটি দিনও সবুর সইবে না। কেদার রায়ের অভিনয় করবার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এ দলে নেই, তাই…যঃ পলায়তি স জীবতি…

কাহিনী শুনিয়া সকলেই রুষ্টকণ্ঠে বকর বকর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পদ্মপিসী এতক্ষণ আত্মবিহ্বলের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন, একটু আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, তা' ঘোষাল, কেদার রায়ের পার্ট বাদ দিলে কি থিয়েটার হ'তনা। খামকা এই শীতের রাত্রে এনে কষ্ট দেওয়ার কি কাজ ছিল বল দেখি। আর গাঁয়ে এত লোক থাকতে তারক ভটচায্যি না হ'লে তোদের থিয়েটার হয় না বাপু, কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড। অমন থিয়েটারের মুখে আগুন…আর সেই মুখপোড়া ভটচায্যি-ই বা কেমন লোক, একদিন পরে গেলে কি শ্যালীর বিয়ে একেবারে ফুরিয়ে যেত নাকি!

ইহার উত্তর কে দিবে!

* * *

দৈনন্দিন ঘটনা মানুষের আয়ত্তের বাইরে কখন যে কোন অজ্ঞানিত পথে চালিত হয়, ইতিহাস এখানে আজও মৌন হইয়া আছে।

দুর্ঘটনা

খট্-খট্-খটাঙ্...এইমাত্র একটু শব্দ কানে এসেছিল, জেগে দেখি, জামা কাপড় সব কাদায় একাকার, কি করে যে গাড়ী থেকে ছিট্‌কে এসে এখানে পড়েছি, আমি নিজেই তা টের পাইনি! চারিদিকে কালকাসন্দা, জলকচু আরো কি সব বিশ্রী জংলী গাছ, লতাপাতার দল পরস্পর মিলে মিশে একটা ঝোপের সৃষ্টি করেছে, ভাগ্যিস তারই লতায় পাতায় জড়িয়েছিলুম, নইলে একেবারে পগারে পড়ে বেঘোরে পৈত্রিক প্রাণটা এখানেই খতম হয়ে যেত!

চারিদিকে আর্ত্তনাদ, কোলাহল, এবং হৈ-হৈ-রৈ-রৈ শব্দে আমার চমক ভাঙল। উঠে কোনমতে দাঁড়িয়ে দেখি, ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, কোথায় রেলগাড়ীতে শুয়েছিলাম সুখে,...আর একি ভীষণ কাণ্ড, ব্যাপারখানি বুঝতে আমার দু'মিনিট লেগেছিল। রাত্রি যে তখন ক'টা বাজে আন্দাজে কিছুই বুঝতে পারিনি, আকাশের এক কোণে একটি তারা দপদপ করে জ্বলছিল, এবং পূবদিকটা একটু ফর্সা হয়ে উঠেছে যেন মনে হল! শিশির-ভেজা গাছ-গাছড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ে দেখি, চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ, দূরে, কাছে কালো কালো গ্রামের ভিতর ঘরবাড়ীর মত কি দেখা যাচ্ছিল! খানিকটা দূরে কোলাহলের শব্দ যেন আরো বেড়ে যেতে লাগলো, সুমুখে এগিয়ে গিয়ে দেখি, ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে। কারও হাত গেছে, কারও পা নেই, কারও প্রাণ নেই, গাড়ীর নীচে যে কতজন চাপা পড়ে পিষ্ট হয়ে গেছেন, কিছুই ভালো বুঝতে পারলুম না। সবাই

ছিল ঘুমিয়ে, মাঝখানে এই দুর্ঘটনা, শেষরাত্রিতে যেন সেখানে একটা দস্তুরমত কোলাহলের বাজার বসে গেল। আশে পাশের গাঁ থেকে দলে দলে লোকজন ছুটে আস্‌তে লাগলো, কেউ বা পায়ে হেঁটে, কেউ বা নৌকায় রেল লাইনের অনতিদূরে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুট্‌তে লাগলো।

ভোর প্রায় হয়ে এসেছে তখন, ছুটোছুটি করে যে দৃশ্য চোখে দেখতে লাগলুম, তা'তে যে কি করে মাথা স্থির রেখে চলাফেরা করেছিলুম, ভগবান ছাড়া কেউ জানেন না আমার সেই মানসিক অবস্থার কথা!

গার্ডসাহেবের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না! ইঞ্জিন চালকের একখানি পা গেছে, তাকে রেল লাইনের নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে! কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে, কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, কত দেশের গণ্যমান্য লোক অকালে ইহলীলা শেষ করে গেলেন, সে সব কথা বলবার সময় নেই এখন! তাড়াতাড়ি করে আমরা জন পঁচিশেক সুস্থ লোক গ্রামবাসীদের সাহায্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে অর্দ্ধনগ্ন, অর্দ্ধ গলিত, অর্দ্ধ পিষ্ট, আহত, ভীত, আর্ত্ত নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবকদের নিয়ে টানা হেঁচড়া সুরু করে দিলুম। না পাওয়া যায় কোন কিছু, এইসব রক্তাক্ত দেহে প্রাণ-ভীত জনকয়েক শিশুকে বাইরে এনে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে রাখলুম, তার একটু দূরে একটা ভীষণ গোঙানি শব্দ শুনে ছুটে গেলুম, গিয়ে দেখি ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটি মৃতদেহের উপর আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়ে জনৈকা ভদ্রমহিলা আর্ত্তনাদ করছেন। কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দেখলুম, কিছুতেই কিছু হ'ল না। উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তকরুণ সুরে কি জানি বলছিল, সব কথা ভালো বোঝা গেল কি গেল না, শেষে অনেক

কষ্টে জানতে পারলুম, বউটির স্বামী গাড়ীচাপা পড়ে হাড়মাংস একসঙ্গে তাল পাকিয়ে পড়ে আছে, মেরুদণ্ড থেঁৎলে গেছে, চেহারা দেখে চেনবার জো নেই, ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমার অন্তরাত্মা বারংবার শিউরে উঠতে লাগল! পাশে পাঁচ বছরের একটি এবং বছর তিন হবে বুঝি একটি মেয়ে অবাক দৃষ্টিতে মায়ের কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মায়ের দেখাদেখি একবার হাউহাউ করে কাঁদছে, এবং এক একবার চোখের জল মুছে সবার দিকে তাকিয়ে দেখছিল! বিনোদ বাবু বলে এক ভদ্রলোক খুকীকে কোলে তুলে নিতেই খুকীর সে কি কান্না, "বাবা বাবা" বলে সে আর্ত্তনাদ ক'রে কাঁদতে লাগল। এক বুড়ো ভদ্রমহিলা বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি ত নিশ্চয়ই, ছেলেটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিকে নিয়ে আস্‌তেই আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ভদ্রমহিলাটিকে ফিস ফিস করে বল্লুম, আপনি খোকার মাকে দেখুন, আমি একে দেখছি!

ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল চেহারা, আমার কাছে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, বাবার কাছে যাবো!

অবোধ শিশু সে তো আর জানে না যে, তার বাবা আর বেঁচে নেই, তবু একথা সেকথা বলে তাকে বল্লুম, পরে যাবে।

খোকা সত্যি তা' ধরে নিয়েছে, সে এক ছুটে আমার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে তার মার কাছে দৌড়ে গিয়ে বললে, মা, বাবা আসবে, সত্যি দেখো, নিশ্চয়ই আসবে, তুমি কেঁদো না।

সেই বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা আমাকে চোখের ইসারায় খোকাকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যেতে বল্‌লেন, সেই তরুণীটির ঘন ঘন মূর্চ্ছার ভাব তখনও দেখা যাচ্ছিল।

বেলা তখন দশটা বাজে, রিলিফ গাড়ী একখানি এসে গেছে,

লোকজন, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, নার্স, কোন কিছুরই অভাব নেই এখন। লোকের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে, গ্রাম্যবধূরা, ছেলেমেয়ের দল, কৃষক মজুর, যে যেখানে ছিল যত রাজ্যের লোক এসে জুটেছে সেখানে। শুধু লোক আস্‌ছে আর যাচ্ছে, কেউ কারও খোঁজ খবর নেয়া কর্ত্তব্যের মাঝে আনেনি। বরং আমাদের বিপদের সুযোগে ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম এত চড়িয়ে দিলেন যে, ফলে দুধের সের আট আনা এবং ফলমূল এবং খাবারের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে গেল !

কয়েকজন সৎসাহসী যুবকেরা মৃতদেহ সৎকারের কিছু ব্যবস্থা বিলি করলেন, অনেকের আত্মীয় স্বজন এসে পড়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড় কমে আস্‌তে লাগল। এবং সন্ধ্যা হয়ে না আস্‌তেই আর লোকজনের টিকি দেখতে পাবো কিনা সন্দেহ ! মনে বড ভয় হ'ল, এই বিদেশে, বিভুঁয়ে কোথায় যাবো এখন এদের নিয়ে, এবং আগন্তুকদের শত সহস্র কুৎসিত দৃষ্টির মাঝখানে এই তরুণীটিকে এবং শিশু পুত্রকন্যা দুটিকে কার জিম্মায় রেখে যাব, তাই ভাবছিলুম বসে ! এক ভরসা ছিল, রেল লাইনের শ'খানেক কুলি, পাঁচ ছয়জন বাবু এবং আনুষঙ্গিক আরো কয়েকজন কর্ম্মচারীয় মুখ দেখতে পাবো, তাদের সারারাত্রি কাজ করবার কথা। তবে হুহু করে যে হাওয়া বইছে, এই শীতের রাত্রিতে পেরে উঠবে কিনা সন্দেহ।

বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীটি উঠে বস্‌ল। আমি তাকে কত রকমে বুঝিয়ে বল্লুম, আমার কথায় যেন কাজ হয়েছে বোঝা গেল। ছেলেটি রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিল, খুকী তার কাছে ঘোরাফিরা করছে।

রেলওয়ের একজন বাবুর কাছে শোনলাম, আগে এবং পেছনে দু'জায়গাই রেল-লাইন খারাপ হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরই

গাড়ী চলাচল সুরু হবে। তরুণীটির কাছে অনেক খোঁজ খবর নিলুম। নিয়ে জান্‌তে পারলুম, এর স্বামী আয়কর বিভাগে অফিসার ছিলেন, রঙপুরে থাক্‌তেন, কি-একটা কাজে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, আজ সাত বছর হল এদের বিয়ে হয়েছে এবং কি সুখে দিন কাটছিল সে সব কথা বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দুটি থেকে ক্রমাগত অশ্রু ঝরে পড়ছিল। সংসারে আপন বল্‌তে তেমন কেউ নেই, খোকার জ্যেঠামশায়রা নাকি বাংলা দেশের বাইরে কোথায় থাকেন, তাদের সাথে তেমন বনিবনা নেই কথায় কথায় আমাকে বল্‌লে! আরো অনেক কথা শোনলুম, শেষে ঠিক হ'ল ওদের আমি আপাততঃ রঙপুরে নিয়ে যাবো! তারপর কি হবে ভগবানই জানেন। এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছিলুম পাহাড় ছেড়ে বাংলাদেশের একটা সহরে, সেখানে যাওয়া আর হবে কিনা কে জানে,—মনে মনে ভাবলুম, খোকাদের রঙপুরে নিয়ে যাবো, সেখানে দিন দুই থেকে সটান একেবারে লম্বা পাড়ি দেব আসামের দিকে!

ভদ্রলোকের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্য এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছিলাম। যাদের আত্মীয় স্বজন কেউ সঙ্গে ছিল না, তাদেব মৃতদেহ, শোনলুম, মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। সে সব কথা কাণে না তুলে লোকজন সংগ্রহের জন্য একজন রেলওয়ে বাবুকে ধরলুম, তিনি আমাকে একজন ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক আসছি বলে যে কোথায় অন্তর্ধান হলেন, দু'মাইলের ভিতর তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি একটু সন্দিহান হয়ে উঠলাম!

খোকার মা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে লোকজন পাওয়া যাবেনা? এত রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা আছেন।

আমি কোনমতে বল্লুম, দেখি পাওয়া যায় কিনা, তারা সবাই কাজে ব্যস্ত আছেন, লাইন রাতারাতি মেরামত করতে হবে কিনা!

একজন গ্রামের লোক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, কোথায় মশায় বাসি মরা নিয়ে হাঙ্গামা করবেন, গাড়ীতে বোঝাই করে দিন।

আমি তাকে চোখ ইসারায় বল্লুম, এখানে মৃত ভদ্রলোকের স্ত্রী, পুত্রকন্যা রয়েছেন এবং ভদ্রলোক নিজে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তার মৃত দেহ···

সেই গ্রাম্য লোকটি সে কথা শুনে কথার সুর বদলে নিয়ে বল্‌লে, কি বলেন মশায়, লোকজন পাওয়া যাবে না, আমি দশজন লোক ডেকে নিয়ে আস্‌ছি, আপনি ঘাবড়াবেন না মশায়, কিছু প্রাপ্তির আশা থাকলে ওইসব ছোট লোকদের দিয়ে না করানো যায় এমন কাজ নেই। কথায় আছে, টাকা হলে বাঘের চোখ মিলে।

লোকটির কথা শুনে আমি থ' খেয়ে গেলাম! একে রক্ত গরম, তার উপর কলেজে পড়ি, এ সব বাজে কথা কোনদিন বরদাস্ত করতে পারিনি, কিন্তু অসহায় অবস্থা ভেবে চুপ করে গেলুম!

খোকার মা সব কথা শুন্‌তে পেয়েছিল, আমাকে ডেকে বল্‌লে, লোকটিকে বলুন না লোকজন নিয়ে আস্‌তে, যা খরচ লাগে দেব, মরা আর কত বাসি হবে বলুন!

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়, আমি তার মিনতি ভরা চোখ দুটির পানে চেয়ে দেখলুম, সেখানে অশ্রু টলটল করছে। কি সুন্দর দুটি চোখ, অমন সুন্দর চোখ জীবনে আর কখনো দেখিনি। দোলনচাঁপা রঙের পাত্‌লা ছিপছিপে দেহখানিকে কি করে শুভ্র বসনে আবৃত করে রাখবে, এত সুখ, সাধ, জীবনের আশা ভরসা, বাসনা কামনা, সবই তার এক নিমেষে ফুরিয়ে গেছে, এই কথা ভেবে মনে বড় দুঃখ হ'তে লাগল।

বহুদিন আগে যখন আমার মেজবৌদি মারা যান, তখন তার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে আমি ক্লাশের বেঞ্চে চুপ করে বসে হাতের আড়ালে

কত চোখের জল গোপনে মুছে ফেলেছি! ঠিক যেন তারই মত গোলগাল গড়ন, ভাসা ভাসা দুটি চোখ, হাসিমাখা মুখখানি,...সেই ঝুনু বৌদির কথা আজও আমার মনে পড়ে!

আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে সেই লোকটি আবার বল্‌লে, কি মা, আপনিই না হয় বলুন, ক'জন লোক নিয়ে আস্‌ব, খোকা বাবু ত ভড়কে গেছেন শোকে দুঃখে, আর তা' যাবারও কথা! আমাদের মত বয়স হলে তখন এসব কিছু থাক্‌বে না! ওই যে টোকানি সা'র গদীর লোক আস্‌ছে এই দিকে, দেখি দেবা ঘোষাল কি বলে, বলেই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই লোকটি আগন্তুকের কাছাকাছি গিয়ে বল্‌লে, ঘোষাল, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে বলোতো, সরু কল্‌কে না বোতল! এবং পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে বল্‌লে, চলো দেখি, বাজারের গান্ধীকে পাই কিনা!

দেবা ঘোষাল এক গাল হাসি হেসে বল্‌লে, কে, অনাথ? অনাথকে আমিই নিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু পাঁচকড়ি দা', মনাই চক্কোত্তি আর কেবলপুত্তির কাছে তুমি নিজেই যাও। আমার নাম করে বলো, আমরা সবাই ক্যাবলাভিটার ধারে যাচ্ছি!

দেবা ঘোষাল খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে রাসভকণ্ঠে গান ধরলে,

ওরে ভাই ক্যাবলাভিটার মাঠে
আমি দেইখ্যাছিলাম তাকে,
তাকে তাকে ছিলাম রে ভাই
বাব্‌লা বনের ফাঁকে......

রেল লাইনের এক পাশ থেকে পাঁচকড়ি দা' বলে উঠলো, আরে ঘোষাল, ভয় কিসের? আসবো নাকি?

ঘোষাল এমনি ভাবে গান ধরেছিল যে পাঁচকড়ি দা'র কণ্ঠস্বর তার

কানে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ! দিগন্তজোড়া মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোক যতদূর দেখা যাচ্ছিল, ঘোষাল গান গেয়েই চলেছিল।

রেল লাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়ার চিকরিকাটা পাতাব ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছিল, সেই গাছের নীচে খোকাখুকী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খোকার মা বল্‌লে, কত টাকা লাগ্‌বে?

আমি বল্লুম, সে যা' হয় হবে 'খন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

খোকার মা বলে উঠ্‌ল, আপনাকে পেয়ে যে কী বল ভরসা পেয়েছি, তা বলতে পারছিনে। স্বামী কারও চিরদিন থাকেনা, সে ত ভালো জানি! এখন বলুন, কোথায় গিয়ে যে থাক্‌ব তাই ভাব্‌ছি। দেশের বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত যাইনি, কি রকম সেখানের আত্মীয় স্বজন, লোকজন জানিনে, আর রঙপুরে গিয়ে কি করে থাক্‌ব একা এই দুটি শিশু প্রাণী নিয়ে··· ·

—আপনার বাপের বাড়ী?

—তাদের কথা বলে লাভ কি! বাবা নেই, মা আছেন না থাকার মত। ভাইদের এখন সংসার,, বৌদিরা হলেন কর্ত্তা!

নানা গল্পে ভোর হয়ে গেল। মৃতদেহও সংকার হয়ে গেছে, দেবা ঘোষালের হাতে দশটি টাকা গুঁজে দিয়েছিলুম, সেই নিয়ে শোনলুম, পাঁচকড়িদা'র সাথে তার একটা হাতাহাতি হয়ে গেছে! এমন চশমখোর লোক আমার জীবনে এই প্রথম দেখা।

বেলা আটটায় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খোকা খুকীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল রঙপুরে যাবার নামে। খোকার মা ঘোম্‌টার ফাঁকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। যতক্ষণ না গাড়ীখানি চলতে সুরু করেছিল, খোকার মা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখছিল এবং ক্রমাগত উদ্গত অশ্রু বসনাঞ্চলে মুছে ফেলতে লাগলো।

তিন চার দিন রঙপুরে ছিলুম। সেখানে ওদের চেনা জানা এত ছিল, তু'একজন ভদ্রলোক এসে মুখের ভদ্রতা করে চলে গেলেন। একজনের অভাবে কেউ আর তেমন করে চিন্‌তেও চাইলে না, এইত জগতের চিরন্তন নিয়ম। ওদের ছেড়ে যে কি করে যাবো, তাই ভাবছিলুম বসে। খোকাকে নিয়ে তু'একদিন সহরে বেড়াতে বেরিয়েছি, সবার কাছে খোকা বলে, আমার 'কাকাবাবু', খুকী বলে "কাকু",... আমি ওদের মাকে বৌদি বলে ডাকতুম, এমনি একটা মাখামাখি, হৃদ্যতা হয়ে গেছে সবার সাথে। মেজ বৌদির কথা আমি ভুলিনি, আমার যেন মনে হ'ত এই আমার সেই মেজ বৌদি! তাকে হাবিয়েছিলুম শুধু ফিরে প্াবার জন্য! আমার অন্তরের কথা এই বৌদি কি করে জানতে পারলেন, ঠিক জানি না, কিন্তু এদের অসহায় অবস্থা ভেবে আমি ব্যাকুল হযে উঠতুম! বাপ-দাদা বেঁচে ছিলেন তখন, গাছের,—গাছের ছায়ায় ছিলুম, কোন ধাব ধারিনি কারও, সংসারের ভাবনা কোন দিন কাছেও আসেনি। তাই চুপটি করে বসে ভাবতুম—বৌদির কথা, কি হবে তাদের, আমি চলে গেলে কে তাদের দেখ্‌বে; এই সব নানা কথা আমার তরুণ মনে নিয়তই উঁকিঝুঁকি দিত! আর বৌদিও যেন কেন জানি আমার উপর সব বিষয়ে নির্ভর করে যেতে লাগলেন। সব কথায়, সব কাজে আমার পরামর্শ নিতেন, আমার বয়সই বা কি এমন যে তাকে আমি কিছু ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারি। আর বৌদির বয়সই বা কত, বড় জোর পঁচিশ, আমার চেয়ে তু'এক বছরের বড হবেন বোধ করি।

খোকার বাবা ওদের জন্য কিছু টাকাকড়ি রেখে গেছেন একথা বৌদি একদিন আমায় কথায় কথায় বললেন, এবং এখন ওঁরা বাব্‌লাহাটিতে ওদের দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে, শেষে অন্য ব্যবস্থা হবে। বৌদি যে ভালোমানুষ, টাকাপয়সা নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে

থাকবেন, আমার জানি কেমন মনে হল। একে চোর ডাকাতের ভয়, গ্রামে আবার তেমন লোকজনও নেই,...কল্পনায় অনেক কিছু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত!

দিনকয়েক আর রঙপুরে ছিলুম মাত্র।

তারপর বড় দুঃখে এবং বেদনায় বৌদিকে নিয়ে বাব্‌লাহাটিতে রওনা হলুম! ঝিকরদহ ষ্টেশনে নেমে আমাদের নৌকায় যেতে হবে বাব্‌লাহাটি। ঘণ্টাখানেকের মাত্র পথ, উজান খাল ছাড়িয়ে নৌকোখানি মাঠের ভিতর গিয়ে পড়লো। দুই দিকে সবুজ ধানের বুক চিরে নীল জলের রেখা তর তর করে বয়ে যাচ্ছে, নৌকোর তলায় জোয়ারের জল বেধে এক একবার কলকল শব্দ করে উঠছে, আর খানিকটা বাদেই পচা কচুরিপানা, বিশাল দামের ওপর দিয়ে যাবার সময় মাঝি নৌকাখানিকে পা দিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে লগি ঠেলে যাচ্ছিল।

খোকার সে কি আনন্দ! ছইএর ভিতর চুপটি করে বসে দেখছে এবং মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ধানের ডগাগুলি টেনে আনছিল! আমার কত কথাই মনে হতে লাগলো! দু'দিন আগে এরা কত বড়লোক ছিল। ঠাকুর, ঝি, চাকর, চাপরাশী, মোটরকার সবই ছিল এদের, আর আজ একজনের অভাবে এরা সাধারণের পর্য্যায়ে এসে নেমে গেছে! কত সবুজ মাঠ পেরিয়ে, কত বাঁশ ঝাড়ের পাশ কেটে একটা খালের ধারে এসে নৌকাখানি ডাঙ্গায় ভিড়তেই আমি এক লাফে তীরে উঠে খোঁজখবর নিলুম, ৺মহেশ গাঙ্গুলীদের বাড়ী কোন দিকে? একটি ছেলে আমাকে বাড়ীর হদিস্ বলে দিলে। একটা পুরাণো বাড়ীর সামনে এসে যখন দাঁড়িয়েছি এক দঙ্গল ছেলেপেলে হৈ হৈ করে ছুটে এল, জনকয়েক বৃদ্ধ, বাড়ীর মেয়েরা, এবং পাড়ার কৈলাস ঘোষাল হুঁকো হাতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন! বৌদির কথামত শীতল গাঙ্গুলীর

পুত্রবধূ পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তেমন একটা সাড়াশব্দ দিলে না। কে একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এসে বললেন, কে, বীরুর এমন সর্ব্বনাশ হল কবে গো বলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, সাথে সাথে আরো জনকয়েক। আমরা হতভম্ব হয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিলুম, কেউ একবার বললে না যে, ঘরে এসো। বেগতিক দেখে আমি বৌদিকে নিয়ে সুমুখের একটা ঘরের দাবায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। শোক, দুঃখ, হাহাকার এসবের অভিনয় হতে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, এর পরই সবাই এসে খোঁজখবর নিতে সুরু করলেন, টাকা পয়সা কেমন রেখে গেছে বৌমা, তোমাদের ত আর অকূলে ভাসিয়ে যায়নি, বীরু ছিল আয়করের হাকিম, দু'পয়সা নিশ্চয়ই রেখে যাবার কথা!

এ কথার কে কী জবাব দেবে,···একজন বৃদ্ধা বললেন, তোমাকে ত চিন্‌তে পারলুম না বাবা? তুমি কি বৌমার···

বৌদি জবাব দিলেন, আমার ছোট ভাই!

কৈলাস ঘোষাল বললেন, ছোট ভাই! বসো, বসো বাবা, বেশ করেছ, শত হলেও স্ত্রীলোকের স্বামীর ভিঁটা···যথাস্থানে নিয়ে এসেছ, বেশ করেছ!

কোনমতে জবাব দিলুম, সে ত সত্যি কথা!

বৌদি আমাকে চুপি চুপি বললেন, তুমি আমাকে আজ থেকে 'ছোড়দি' বলে ডেকো।

প্রতিবাদ করবার মত আমার কিছু ছিল না, বৌদি, ছোড়দি' সবই সমান আমার কাছে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বসে আছি, ঈশান মুখুয্যে এসে চুপি চুপি আমাদের কাছে বলতে লাগলেন, এই ঘর বাড়ী তোমারই বৌমা, দয়াল আত্মসাৎ করে বসেছিল। আমরা পাঁচজনে জানিনে, শীতল

আসাম থেকে শালকাঠ এনে এ ঘর তুলেছিল। তোমরা ত দেশে আসো নি এতকাল।

দুপুরবেলা শুনছি, মালতীর মা বলে একজন ভদ্র মহিলা এসে খানিকটা চোখের জল ফেলে বললেন, তোমরা আমাদের পর নও, আমি তোমার ঘরসংসার দেখবো, তুমি এসব কোনদিন করেছ!

সেই দিন থেকে মালতীর মা এবং মালতী এ বাড়ীতে চিরস্থায়ীরূপে বহাল হয়ে গেলেন।

খোকা ও খুকী ত এ সব দেখে শুনে অবাক, তারা গ্রামের লোকজন কখনও দেখেনি, ইয়া বড় বড় গোঁফদাড়ি, ইয়া লম্বা চেহারা, দু'একজন কাপালিকের মত ভগ্নবস্ত্র পরে যখন আনাগোনা করে, তারা ছুটে যায় মায়ের কাছে!

সেদিন কৈলাস ঘোষাল এসে হত্যা দিয়ে 'ছোড়দি'র' কাছ থেকে দশটি টাকা গাপ করে নিলেন, কেউ কাপড়-চোপড়, কেউ টাকা-পয়সা, কেউ চাল, ডাল, নুন, তেল, যে যা পায়, তাই নিয়ে যাচ্ছে। 'ছোডদি' কাউকে না করতে পাচ্ছেন না, এমনি মধুর স্বভাব তার!

চার পাঁচ দিন হয়ে গেল এসেছি। এরি ভিতর সব গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি যাবার কথা তুললেই ছোড়দি' বড় দুঃখ করেন, বলেন, উনি ত তোমার হাতেই আমাদের দিয়ে গেছেন! সত্যি কি তা!

চুপ করে থাকি, কোন জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পাইনে। অজিত ওরফে খোকা এবং বাপী ওরফে খুকী ওরা দুজনে আমার গায়ে গায়ে লেগে আছেই, যেন জগতে ওরা শুধু আমাকে চিনেছে।

দয়াল গাঙ্গুলী রাশভারী লোক, একদিন কথায় কথায় বললেন আমাকে, তুমি আর কাজকর্ম্ম নষ্ট করে কতদিন এখানে বসে থাকবে! তুমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও বাবাজী, আমরা দশজন যখন রয়েছি,

তখন চিন্তার কিছু নেই। শুধু বৌমাকে একটু বলে যেয়ো, হাতটা যেন শক্ত করেন। হাঘরের দল ত চিরদিনই হাঁ করে আছে; আমরা হলুম জ্ঞাতি, এগারো দিনের বুঝলে কিনা, আপদে বিপদে খবর পেলে ছুটে আসব আমরাই,...তখন তোমার কৈলাস খুড়ো, রায় গিন্নি আর বৈকুণ্ঠ ভট্টচার্যির টিকিটিও দেখতে পাবেনা ..আরও কি তিনি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কৈলাস ঘোষালকে সুমুখে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে কথার সুর বদ্‌লে বল্‌লেন, এই যে কৈলাস খুড়ো এসেছেন, খুড়োর ওপর সব ভার দিয়ে যাও।

কৈলাস খুড়ো সন্দিগ্ধ নেত্রে ক্ষণকাল দৃকপাত করে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, আর বাহাদুরী করতে হবেনা দয়াল, আমি সব শুন্‌তে পেয়েছি,· এবং পরক্ষণেই দয়ালের পানে বিষম ভ্রূকুটি করে ফের বল্‌লেন, জায়গা জমি সব ভোগ দখল ছেড়ে দিতে হবে এবার কিন্তু!

দয়াল চুপ করে থেকে কি-একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, কৈলাস খুড়ো বাধা দিয়ে বল্‌লেন, চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে না, কত লোকের বাস্তুভিটায় তুমি ঘুঘু চড়িয়েছ, এবার তোমার পালা,...কি বলো দয়াল?

দয়াল হুম করে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, বেশ করেছি, তোমার তা'তে কি শালা? যেমন বলা, কৈলাস খুড়ো এক হাতে এক পাটি খড়ম এবং অন্য হাতে বেতের লাঠি গাছি শূন্যে তুলে বিষম আস্ফালন করে ছুটে গেলেন। একটা রক্তারক্তি কাণ্ডের উপক্রম প্রায়, কোনমতে থামিয়ে দিয়ে বৌদির কাছে গিয়ে বললুম, দেখলেন ত কাণ্ডটা, গ্রামে কি করে থাক্‌বেন বৌদি একা! তার চেয়ে সহরে থাকা ঢের ভালো নয় কি!

বৌদি হেসে বল্লেন, এসব ভাই দু'দিন থাকলেই গা-সওয়া হয়ে যাবে। সহরে গিয়ে কার আশ্রয়ে থাকবো বলো, তবু গ্রামে দু'চারজন লোক আছে। এদের মুখ চেয়েই এখন জীবন কাটাতে হবে!

বড় দুঃখ হ'ল শুনে। দিন কয়েক পরে যেদিন ফিরে এলুম, নদীর

তীরে ওরা সবাই এসেছিল, নৌকাখানি তীর থেকে ছেড়ে আসতেই খোকা ও বাপীর সে কি মর্মন্তুদ কান্না,...আড়ষ্ট চোখে চেয়ে রইলুম। বৌদি ঘোমটার ফাঁকে ক্রমাগত অশ্রুজল বসনাঞ্চলে মুছে ফেলে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখছিলেন।

নদীর বাঁকে এসে ফিরে দেখি, সবাই তখন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ধীরে ধীরে নদীর তীর, গ্রামখানি, উঁচু গাছ পালা, বনানী, মঠের চূড়া,... সব অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। ....

আজ দশ বছর প্রায় হয়ে গেছে। সংসারের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, বাবা ইহধাম ত্যাগ করেছেন, সাথে সাথে ছোট ভাইটি, দিদি, পিসিমা,.........!

বাংলা দেশে আর ফিরে যাইনি। মাঝে মাঝে পাহাড়িয়া পথে নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বুকে নিয়ে যখন পথ চলতে থাকি, মনে পড়ে ছায়া ঘেরা, পাখীর গানে জাগা সবুজ মাঠের ধারে একখানি নগণ্য পল্লীর কথা, মনে পড়ে খোকা, বাপীর কথা,...না জানি তা'রা আজ কত দূরে, কোথায়, কিভাবে আছে...

আর আমার সোনার বৌদি,...অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ, পবিত্রতায় গড়া সেই মহিমাময়ী দেবী মূর্ত্তিকে প্রতিনিয়ত সকাল সন্ধ্যায় চোখের সুমুখে দেখতে পাই! কি একটা অসহ ব্যথায় আমার মন প্রাণ ভরে আসে, সেই গভীর নিশীথের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে... ...!

আকাশ যখন গাঢ় নীল হয়ে ওঠে, সবুজ ধানের দোলনা সুরু হয়, গাছে গাছে মুহুর্মুহু ঘুঘুর ডাক শোনা যায়, কি-এক অজানার ব্যথায় মন কেঁদে ওঠে জানি কেন, মনে হয় একবার বাংলার বুকে ফিরে যাই। বাংলা দেশের পথ ঘাট, মাঠ, হাট আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে! তখন পাহাড়ের কোণে চুপ করে বসে থাকি, আর ভাবি,.........

দেশের মায়া

পাহাড়িয়া দেশে যেমন বিনা নোটিশে বৃষ্টি নামে, ঠিক তেমনি ভাবে শীতের ছুটিতে অর্ণব দেশে যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিল। পরদিন দুপুর বেলা মোটরে চাপিয়া সিলেটের পথে যাত্রা করিতে হইবে. একথা সে ইলাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিল। ইলা বিস্ময়ে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কালই যাবে ?

অর্ণব তাড়াতাড়ি কোটের পকেট হইতে রিটার্ণ টিকেটগুলি বাহির করিয়া কহিল, এই যে ত্মাখো !

প্রিয়তমা পত্নী ইলা একটুখানি অভিমানের সুরে কহিল, বেশতো, বলা নেই, কওয়া নেই, টিকিট কেনা হয়ে গেছে। তা'হলে তোমরা যাও, আসগে,···আমি যাবো না।

অর্ণব হাসিয়া শিস্ দিতে দিতে কহিল, তুমি যাবেনা বুঝি, কেন ? শিলঙের শীতে বরফে জমে তুমি চুপ করে বসে থাকো এখানে। আমরা পলাশপুর থেকে ঘুরে আসি।

—বেশ তো যাওনা, আমি কমলানেবুর দেশে·········

—আর আমাদের পলাশপুরে, ছ'গায়ে ইয়া বড বড় সন্দেশ, দু'পয়সা সের দুধ, বারো আনা ঘিয়ের সের, কত রকমারি খাবার !

ইলা আবদার করিয়া কহিল, বারে, আমার জন্য বুঝি কিছু নিয়ে আস্‌বে না ? নীপাও যাবে ?

—যাবে না তো কি বসে থাকবে ! তুমিও চলোনা, বেশ মজা হবে কিন্তু ! যাবে ?

শিলং থেকে চলে যাওয়ার নামে ইলার মুখখানি সহসা মলিন হইয়া উঠে। এই সহরে তার প্রাণের পুতুলি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে,—ওই দূর সরল বনানীর উপান্তে পার্বত্য স্রোতস্বিনীব কাছে, তাহাকে একা ফেলিয়া যাইতে ইলার মন সরে না। আজ প্রায় বছর খানেক অতীত হইয়া গেছে, তবু সে ভুলিতে পারে নাই! শিলঙ পাহাড়ের মায়া চিরদিন তাহার মনে এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া আছে, দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া সে কথাই ইলার বার বার মনে পড়ে। মনে পড়ে সুদূব দিল্লী সহরে যখন তাহার সোণার শৈশব একটানা সুখে কাটিতেছিল, পৃথিবীতে রোগ, শোক, দুঃখ বলিয়া যে আরো কিছু আছে, তাহা সে ভাল জানিত না! কৈশোরের স্বপ্নের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। প্রথম দু'একবছর সে ভালো করিয়া অর্ণবের চোখোচোখি চাহিয়া কথা বলিতে পারে নাই। কোথায় দিল্লী, আর কোথায় শিলং পাহাড়, অদ্ভুত যোগাযোগ কিন্তু!

বিবাহের পর ইলার এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। দিল্লী থাকিতে চোখে মুখে কথা বলিতে, বাইক চড়িতে, নৌকায় দাঁড় টানিতে, কলেজের ছেলেদের সাথে হল্লা করিতে তাহার জুড়ি দ্বিতীয়টি ছিল না। গান গাওয়া তার অভ্যাস আছে, কিন্তু প্রাচ্যনৃত্যে সে একসময় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সে অবাঙ্‌মুখে ঘরের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়ায়, অকারণে উদ্‌গত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া চুপ হইয়া বসিয়া থাকিতে বেশী পছন্দ করে! আজ না হয় তাহার কন্যা বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু চিরদিন ত এমন ছিল না! তবে কেন এমন হয়! হায়রে পুত্র কন্যার মায়া!

অদ্যাবধি পলাশপুরে সে একবারও যায় নাই! গ্রামের নাম শুনিলে সে শুধু মনে করে, ম্যালেরিয়া, পচা ডোবা, ভাঙা ঘর, চোর ডাকাতের

ভয়, দুর্দ্দশার একশেষ, সেখানে কেহ থাকেনা, শ্মশানপুরীর মত দেশ,··· কথাটি যে একেবারে মিথ্যা, সে কথা বলা চলে না!

অনেক সাধাসাধি, অনুনয়-বিনয়ের পর শেষে ঠিক হইল ইলা দশবারো দিনের জন্য পলাশপুরে যাইবে। নীপা আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিশুমনে আনন্দের জোয়ার জাগিয়াছে দেশে যাওয়ার নামে!

ইলা আজ অবধি পাড়াগাঁয়ে পা দিয়ে দেখে নাই যে, সে দেশটা কি মাটির না সোনার! তবু তাহার শিলঙ পাহাড় খুব ভালো লাগে, এমন কি পাহাড়ের মায়া ছাড়িয়া সহজে সে দিল্লীতে বাপমায়ের কাছে যাইতে চাহে নাই।

জানালার ধারে বসিয়া ইলা প্রতিদিন মোটর গাড়ীর যাতায়াত দেখিতে থাকে, তাহারা কোথায় যায়, কেন আসে, এসব দেখিতে তাহার খুব ভালো লাগে। কত লোকজনের যাওয়া আসা দুদিনের জন্য, কোন কিছু যেন স্থায়ী নয়, পিছনে পড়িয়া থাকে শুধু অতীতের অন্ধকার, ভবিষ্যতের সোনালী আশা!

শিলঙের পথে আঁকাবাঁকা মোড়গুলি ঘুরিয়া মোটর গাড়ী সশব্দে ছুটিয়াছে। আশেপাশে, দূরে, কাছে ধূসর গিরিশ্রেণী আকাশের গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া। সুমুখের দিকে চাহিয়া নীপা হাতে তালি দিয়া নজরুল ইস্‌লামের 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু···'গানটির শুধু একটি চরণ ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতেছিল। ইলা শুধু পিছনের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। অর্ণব দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ঝিমাইতেছিল, বোধ করি তাহার একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে। ইলা ঠেলা দিয়া বিব্রত ভাবে কহিল, বারে বাঃ, বলে কয়ে নিয়ে আসা হ'ল, আর নিজে বুঝি চুপ চাপ্, আমার বুঝি আর ঘুম পায়না?

মৃদু হাসিয়া তাহার কথা এক রকম উড়াইয়া দিবার মত ভাবে কহিল, আমি বসে বসে নীপার গান শুনছিলাম।

—গান শুন্‌ছো না ছাই, বলিয়া ইলা অর্ণবের গায়ে মৃদু একটি ঝাঁকুনি দিয়া কহিল, দেখো, দেখো কী চমৎকার, তুলা পেঁজার মত ধোঁয়াটে মেঘ আমাদের আশেপাশে ছুটে যাচ্ছে।

নীপা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, কই মা, আমায় ধরে দাও না?

অতুলনীয় ভ্রূযুগল উন্নত করিয়া ইলা কহিল, ওমা, কি বলো তুমি! মেঘেরা কত দূরে থাকে, সে কি ধরা যায় বোকা!

নীপা তাড়াতাড়ি হাত পা নাড়িয়া কহিল, কেন যাবে না, এই তো কাছে!

অর্ণব মৃদু হাসিয়া ইলার দিকে চাহিয়া কহিল, ওইত মজা, কাছে এলেও কাছে পাওয়া যায় না। যেমন মেঘেরা, তেমনি তোমরা! দার্জিলিঙে কতদিন দেখেছি, মেঘগুলিকে আশেপাশে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে গিয়েছি ধরবার জন্য, কিছুই পাইনি, শুধু চোখের জলে ফিরে এসেছি, পেয়েছিও কয়েক ফোঁটা অশ্রু। ওই মেঘের বুকে কি যে রহস্য আছে, ওরা শুধু উদাসীর মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় কত অজানার ব্যথা নিয়ে,—কিন্তু ধরা দেয়না, শুধু মন ভুলিয়ে যায়, ······· দেয়না, দেয়না সে ধরা আমার দ্বারে···।

নীপা ফস করিয়া কহিল, বাবা, পঙ্কজ মল্লিকের গান না এইটি?

ইলা হাসিয়া কহিল, দেখেছ, মেয়ের কি রকম মনে রাখবার ক্ষমতা, যা' তা বলনা ওর সামনে।

অর্ণব ভিজা বিড়ালের মত চুপিচুপি আবার প্রশ্ন করিল, কি যা-তা' বলেছি। আমি বলেছি কি জানো? মেয়েরা সহজে ধরা দিতে চায় না, শুধু মন ভোলাতে জানে!

ইলা অভিমানের সুরে কহিল, এ খোঁটা কেন রোজ রোজ আমায় শোনাও, আমার কি দোষ বলো! দিদিকে তুমি পছন্দ করো, দিদিও তোমাকে কত ভালোবাস্‌ত,...যাক্‌গে ওসব বাজে কথা। আর শীলা, লিলি, সতী, সুপ্রভার কথা নিয়ে রোজ রোজ আমাকে জব্দ করা কেন! এঁরা ত আর সব মেয়েদের মত নয়!

অর্ণব ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, কাজের বেলায় সব মেয়েই সমান!

ইলা হাসিয়া দূরের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল, এই বুঝি তোমার লাইলক্কটের গড়, ওরে বাব্বা, এই অতল খাদে যদি একবার আমাদের গাড়ী গড়িয়ে পড়ে যায়—

অর্ণব গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, পড়ে যাওয়া অমনি মুখের কথা নাকি!

নীপা ফস করিয়া কহিল, কি পড়ে যাবে মা?

ইলা নীপার ছোট দুইখানি হাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিল, ওই যে সব মেঘগুলি!

—কোথায় যায় মা ওরা?

—আকাশে!

কি-একটা ষ্টেশনে তখন গাড়ী থামিয়াছে। রাত্রি গম্ভীর, টপটপ্‌ করিয়া শিশির ঝরিতেছে, জানালার কাঁচে আবছায়ার মত বাহিরের দৃশ্য দেখা যায়। কুয়াসার ফাঁকে অর্ণব চাহিয়া দেখিল, বড় বড় অক্ষরে লেখা, "আথাউড়া জংসন।" মিনিট পনেরো চুপ করিয়া থাকিয়া লোহালক্কড়ের দানব যন্ত্র আবার হুহু শব্দে ছুটিতে সুরু করিল। কত গ্রাম, কত দেশ, কত নদী, কত প্রান্তর চোখের নিমেষে ছুটিয়া যাইতে লাগিল কে জানে। গভীর নিশীথে দশমীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক

যখন ফুটন্ত যুঁইফুলের হাসি নিয়ে মশগুল, আলোর সাদা আলিপনা আঁকা বকুল তলায় ফুলের গন্ধে পাপিয়ার তানে বিভোর, অর্ণব একদৃষ্টে চাহিয়া আছে ইলার মুখখানির দিকে। ইলার সেই রক্তিম-স্নেহের বর্ণের সাথে সুন্দর খাপ্-খাওয়া লাল টকটকে ঝলমল ব্লাউজের অপূর্ব্ব শোভা যে কি সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহা ভাবিয়া অর্ণবের চোখে ঘুম আসি-আসি করিয়াও আসিতেছিল না। কি সুন্দর তার ভাসা ভাসা দুটি চোখ, টানা ভুরু, অর্ণব যত চাহিয়া দেখিতেছে, ততই যেন সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতেছে। পুলকগর্ব্বে সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব শিহরণ খেলিয়া গেল।

দেশে পৌঁছিতে প্রায় বেলা বারোটা বাজিল। পাল্কীর বেহারাদের অদ্ভুত সারি গানে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, দলে দলে লোকজন ছুটিয়া আসিয়াছে চাটুয্যেদের বৃহৎ প্রাঙ্গণে। দণ্ডী চাটুয্যে আজ জীবিত নাই, তাহার সাধের সোনার সংসারে বাতি দিবার মত যে দু' একজন বাঁচিয়া আছে, তাহারা যে মাঝে মাঝে দেশে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যায়, বাপ পিতামহের সুনাম বজায় থাকে, এই কথা কম্‌সে কম পাড়া প্রতিবেশীরা হাজার বারও তাহাদের কর্ণগোচর করিতে কসুর করে নাই।

পাল্কী হইতে ইলা নামিয়া আসিতেই প্রতিবেশিনীরা হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল, বর্ষীয়সী মহিলারা তাহাকে সাদরে, সাহ্লাদে ঘরে বরণ করিয়া লইয়া গেল। ইলা আড়নয়নে চারিদিকে বার কয়েক চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। এমন অদ্ভুত ধরণের কথাবার্ত্তা, আত্মীয়তা, আন্তরিকতা তাহার জীবনে সে কোনদিন দেখে নাই। কেহ আসিয়া বৌদিদির গায়ের গহনা খুঁটিনাটি করিয়া দেখিয়া লইতেছে, কেহ শাড়ির রঙের বাহবা দিতে দিতে একগাল হাসিয়া পানদোক্তা চিবাইতে লাগিল। ইলার

বিস্ময় তখনও যায়নি। কয়েকটি ছোট মেয়ে তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কেহ মাসীমা, কেহ বৌদি, কেহ মামীমা, কেহ বড়দিদি, কেহ সেজদি, নাম-ডাকের যেন অন্ত নাই—আবদারের সুরে আসিয়া গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, যেন কতকালের জানা শোনা।

দুপুর গেল, বিকেল বেলা দলে দলে মেয়েরা আসিলেন, বুড়োরাও বাদ গেলেন না। গ্রামে রব উঠিয়াছে, অর্ণবের স্ত্রী সাক্ষাৎ পরী, এমন বউ পলাশপুর, দু'গাঁয় এবং দেবভোগে কোনদিন আসে নাই! কৈলেস খুড়ো সায় দিয়া কহিলেন, বউমা যেন দুগ্‌গো পিরতিমা! ঈশান ঘোষাল গ্রামের পুরোহিত। এক গঙ্গা কাদা পায়ে মাখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, কই, বউ মা কই। দেখি একবার। তা' বাবা অনু, দেশে থাকবে তো দিন কয়েক, তোমরা না এলে আমরা যাই কোথা বল দেখি! তা' সব ভালো ত?

অর্ণব পদধূলি লইয়া কহিল, দিন দশ বারো থাক্‌বো ভেবেছি। সব ভালো।

—বেশ, বেশ, তা' দু' একটা ফুলকপি আনোনি বাবাজী!

অর্ণব স্মিতমুখে কহিল, বেশী আন্‌তে পারিনি। যে দূর দেশে থাকি, ঢাকা—কোলকাতা হলে তবু একটা কথা ছিল!

ঈশান ঘোষাল হঠাৎ সে কথার সুর ধরিয়া কহিলেন, তা' জানিনে বাবা, শিলং পাহাড় কি এখানে? সেই বর্মার পথে না কোথায়... বিশুমুখোটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, হিমালয়ের কাছে প্রায়, যে শীত, শুনেছি লোকজন লেপ গায়ে দিয়ে সেখানে ঘোরাফেরা করে।

ঈশান ঘোষাল শীতে হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, এবার দেশেও কি কম শীত বাবাজী। এই দেখো, অটুর কল্যাণে কেমন একখানি বালাপোষ পেয়েছি। বন্ধুক্কর অফিসে কাজ করে, আর

ব্রাহ্মণী এই বুড়ো বয়সে, বুঝলে কিনা বাবাজী, গঙ্গাস্নানের লোভে নাটুর সাথে কোলকাতা সহরে পরিবার গিয়েছেন। যাক্, দিন কয়েক সুখে থেকে আসুক!

কৈলেস খুড়ো গলা কাসিয়া কহিলেন, ঈশেন, তুমি গেলে না কেন বাবা?

ঈশান ঘোষাল গর্বিত হাসিমুখে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, ব্যস্ত কি খুড়ো! চৈত্রি মাসের পর দুটো মাস আম-কাঁঠাল খেয়ে একেবারে কাশীবাসী হব ভেবেছি, কি বলেন খুড়ো?

খুড়ো মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী! এতে আর বলাবলি কি

উপস্থিত সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সকাল বিকাল বহির্বাটীতে লোকজনের জটলা। ঘন ঘন তামাক খাওয়া, নানা বিষয়ে গল্পগুজব চলিতেছে। অন্দরমহলে বউমাকে লইয়া গ্রামের মেয়েরা চুল বাঁধা, সেলাই, বোনা, গল্প, গানের আসর জমাইয়া বসিয়াছে। কাদম্বিনী পিসী চারিদিকে চাহিয়া মেয়েদের রকমসকম দেখিয়া শাসনের সুরে কহিলেন, তোদের সেলাই-ফোঁড়ার চোটে বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায় দেখ্ছি। বউমা যে ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে, ও মাধু, একবার বৌমাকে নিয়ে মধুসূদন ঠাকুরের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো না মা। বাবা, কি সব আরম্ভ হয়েছে···

ইলা পুলকিত হইয়া কহিল, চলো না মাধু ঠাকুরঝি, তোমাদের গ্রামখানি কিন্তু দেখ্তে বেশ। নদীর ধারে পথ হাঁটতে কি চমৎকার লাগে, চলনা শৈল ভাই। কি বলো রেবাদি? হেনা যাবে তো?

হেনা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চলো না, বেশ তো!

খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস ইলার কোনদিন ছিল না। গ্রামে জুতো-মোজার চালচলন এখনও তেমন প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। তবে বৌ-ঝিরা রাত্রিবেলা বাড়ীতে কালেভদ্রে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাড়ী হইতে রওনা হইয়া তাহারা ঘোষালদের পুকুরপাড় ধরিয়া নয়াবাড়ীর বকুলতলার পথে পথ চলিতে লাগিল। চাটুয্যেদের বাঁধা ঘাটলার আশে পাশে পাতা বাহারের সারি, অতসীফুল, কাঁটা নাগেশ্বরের ফুলের সৌরভ, গাঁদা ফুলের বনে ভর্তি, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক! ইহার পরই রজনী করের বাগ্‌বাগিচা। দুপুরবেলা পর্য্যন্ত সেই বাগানে সূর্যের কিরণ ভালরকমে প্রবেশ করিতে পারে না। কয়েকটি ফলন্ত কুলগাছে বসিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া মহানন্দে কুল খাইতেছে। মাধবী ছেলেদের খেজুর রসের লোভ দেখাইয়া কয়েকটি পাকা, ডাঁসা কুল সংগ্রহ করিয়া নতুন বৌয়ের হাতে আনিয়া দিল। পাশেই একটি বড চাল্‌তে গাছ, গাছে অসংখ্য চাল্‌তে ঝুলিতেছিল। খেজুর রসের হাড়ি কাঁধে ফেলিয়া আহম্মদ চৌকিদার গাছে উঠিতে উঠিতে কহিল, মা ঠাকুরুণরা কই চলছেন, বেড়াতে নাকি? তেনারা কবে আসলেন? বুড়াকর্তার নাতির পরিবার না? কত খাইছি, পরছি তেনাগো বাড়ীতে…

এ সব কথাবার্তা শুনিয়া, গাছে গাছে ফলফুল দেখিয়া ইলা ত খুব খুসী!

শৈল ডাকিয়া কহিল, আহম্মদ, বৌঠানকে তোদের যাদব বাড়ীর ভিটার গোটা কয়েক মিঠে চাল্‌তে এনে দিস বাবা, আচার করে দেব। চাল্‌তের আচারের নামে উপস্থিত অনেকেরই রসনা সরস হইয়া উঠিল। আহম্মদ খেজুর গাছের আগডালে ঝুলিয়া গাছ কাটিতে কাটিতে কহিল, কালই দিয়ে আসব, এই কথা কইবেন না আর। আজ ভাবছিলাম,

এক হাড়ি রস, তা আর হইল কই, এই বাতুড় আর পাতিশেয়ালের জ্বালায় অস্থির আমরা !

মাধবী হাসিয়া কহিল, তা দিস্ আহম্মদ। তোদের ঘরের চালের ওপর থেকে গোটা কয়েক কচি লাউয়ের ডগা, আর কয়েকটি ফুলো বেগুন দিয়ে আসিস কিন্তু, ভুলিস্ না যেন !

আহম্মদ বাবরী চুলের গোছা নাড়া দিতে দিতে কহিল, ক্যামনে ভুলুম। গেদার মার কাছে আজ তুপুরবেলাই বলে রাখছি।

ঘোষাল বাড়ীর ছেলে নন্দলাল এক পকেট ভর্তি কামরাঙা আনিয়া কহিল, বৌদি, নূতন দেশে এসেছ, এই নাও কামরাঙা, অর্ণবদা'কে বলে কিন্তু আমাদের থিয়েটারের জন্য এক টাকা চাঁদা দিয়ে যেতে হবে, না হলে চলবে না···

মুখের কথা কাড়িয়া হেনা কহিল, ভারী থিয়েটার, তার আবার চাঁদা, যা, যা, ফড়্ ফড়্ করিস নে···!

পাড়ার অপর একটি ছেলে মুখ ভ্যাঙ্চাইয়া কহিল, ভারী ত থিয়েটার। তুমি রমেশ গাঙ্গুলীর মেয়ে, তোমাকে চিনিনে, একটি পয়সা দেবার নাম নেই আবার মাতব্বরের মত কথাবার্তা !

হেনা বিষম রাগিয়া কি জানি বলিতে যাইতেছিল, মাধবী মাঝখানে পড়িয়া কহিল, ছি নন্দ, ছি টুনু, ও সব কথা গুরুজনদের বলতে নেই, টাকা একটি চাই তোমাদের, হবে 'খন !

ইলা সায় দিয়া কহিল, আমিও আর এক টাকা দেব, কি থিয়েটার হবে তোমাদের ?

হেনা ফস্ করিয়া কহিল, অত আস্কারা দিয়োনা বৌদি, শেষে একেবারে পেয়ে বসবে তোমাকে। জানো ত কুকুরকে 'নাই' দিলে এক লাফে মাথায় উঠতে চায় !

কটমট চোখে চাহিয়া পরেশ কহিল, ওর গায়ের রঙ কালো কিনা তাই বিয়ে হয় না, যত লোক দেখেছে, সবাই মুখ ফিরিয়ে গেছে, আমরা একদিন ক্ষেপিয়েছিলুম, তাই যত রাগ আমাদের থিয়েটারের ওপর! কালো মেয়েকে আবার বিয়ে করবে কে, বলিয়াই ছেলের দল অদূরে গিয়া সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল,—

বুড়ী তুই বিয়ের যোগাড় কর
তোর জামাই এলো দিগম্বর

বলা বাহুল্য হেনার ডাক নাম বুড়ী এবং তাহার গায়ের রঙও একটু ময়লা।

যে দিন কাল; তার ওপর আবার গ্রামে গ্রামে গণ-জাগরণের আন্দোলন। মাধবী ছেলেদের ধমক দিয়া কহিল, কিছুতেই টাকা দেবো না, এই হয়েছে তোমাদের শিক্ষা, না?

টাকা প্রাপ্তির আশায় বিপদ দেখিয়া ছেলেরা জন দুই এক লাফে কাছে আসিয়া মাধবী, ইলা প্রভৃতির পায়ের কাছে উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, পায়ে পড়ি, আর যদি কোন দিন···

মাধবী মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, হেনার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নে···

ছেলেরা এ ও তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, ক্ষমা করো এইবার হেনা দি', কালো বুড়ী হেনা দি'···

হঠাৎ শুনিয়া ফেলিয়া মাধবী বিরক্ত হইয়া কহিল, ফের আবার···

হেনা এইবার জিদ ধরিয়া কহিল, আমি কিছুতেই ক্ষমা করবনা! ছেলের দল বিষম চুপ হইয়া গেল। ইলা তাড়াতাড়ি হেনার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিল, ওরা যে অবুঝ হেনা, তুমিও ওদের সাথে পাগল হবে। পরে

ছেলেদের দিকে চাহিয়া কহিল, যাও তোমরা, খারাপ কথা বলো না কখনও !

জন কয়েক মাটিতে গড়াইয়া কহিল, আর কখনও বলবো না ! মেয়েরা তখন শরৎ করের বাঁশের সাঁকোর কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। নিবারণ পুতি আর যামিনী ভণ্ড্ করের বাড়ীর পুকুরে জাল ছুঁড়িয়া মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল ! যামিনী ভণ্ডের জালে একটা বড় রোহিত মাছ পড়িয়াছে, এরূপ মুখের ভাব দেখিয়া মেয়েরাও কৌতূহলের সহিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিবারণ পুতি এক গলা জলে নামিয়া ডুব মারিয়া দেখিল, সত্যিই রোহিত মাছ জালের নীচে আছে কিনা, এমন সময় বৃহৎ রক্তাভ একটি রোহিত মাছ জাল ছিঁড়িয়া প্রাণভয়ে একলাফে ডাঙায় আসিয়া পড়িতেই তামাকু সেবনরত পরাণ সাধু হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া গেল ! মৎস্য প্রবর আর এক লাফে জলে ছিটকাইয়া পড়িতেই যামিনী ভণ্ড তাহার পিছু অনুসরণ করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তীরে একটা বিষম কোলাহল উপস্থিত হইল, ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, যামিনী ভণ্ড্ নিশ্চয়ই ডুব মারিয়া মাছ ধরিয়াছে, মেয়েরা এ সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া হাসিয়া একেবারে খুন। পরাণ ধূলা কাদা গায়ে মাখিয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়াছে। হরিদাস শিরোমণি রসিকতা করিয়া কহিলেন, পরাণ, তুমি না মাছমাংস ত্যাগী ব্রহ্মচারী। আর একটা জলজ্যান্ত রোহিত মৎস্যের লোভ সামলাতে না পেরে শেষে একেবারে ধূলায় গড়াগড়ি দিলে ! তা হলে তুমি মাছমাংস খাও মাঝে মাঝে।

পরাণ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, খাই, আবার খাইও না। প্রসাদ হলে একটু ঝোল খাই শুধু, জীব হত্যা আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ আছে।

হরিদাস সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন, জীবহত্যা নিষেধ আছে, আর এত বড় একটা মাছের জন্য এত কাণ্ড কারখানা করলে,...এর নাম কি জীব হত্যা নয়?...

রসিক গাঙ্গুলী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, সব কথা দেখিয়া শুনিয়া রায় দিলেন, মাছ ত আর পরাণ সাধু ধরেন নি, ধরতে গিয়েছিলেন মাত্র। পরম বৈষ্ণব ভেবে রোহিৎ মৎস্য ও সাধু মহাশয়কে স্পর্শ করেন নি, এতে আর জীব হত্যা কিসে হ'ল!

উপস্থিত সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ইলা হাসিতে হাসিতে কহিল, চল ভাই ঠাকুরঝি, চৌধুরীদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি। কাল যে কালাচাঁদ বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন না, তার সাথে একবার দেখা করে যাবো। বড় ভালো লাগে আমার তাকে।

গ্রামে আসিয়া ইলার প্রথমে গ্রামের সমবয়সী সঙ্গিনীদের সাথে আলাপ পরিচয় করিতে বাধ-বাধ ঠেকিত, কিন্তু যতই সে প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সাথে মিশিতে লাগিল, তাহাদের আলাপ পরিচয়ে, আদর আপ্যায়নে ইলা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারা সহরের ভদ্র মহিলাদের মত বড় মানুষী চালের কথাবার্ত্তা বলেনা, অকারণে কুৎসা করিতে তাহারা তেমন পটু নয়, কিংবা স্বামীর টাকার বহর, শাড়ি কাপড় জামা জুতা, গা ভরা গহনা, মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ইত্যাদির বড় বড় কথায় যখন তখন কান অতিষ্ঠ করিয়া তোলে না; মুন্সেফ গিন্নী, সবজজ মাসীমা, আণ্ডার সেক্রেটারী পিসীমা, কম্পট্রোলার কাকীমা এই সব বড় বড় পদস্থ কর্ম্মচারীর আভিজাত্যে উচ্চাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না, এখানে শুধু মনের সত্যিকার পরিচয়। এখানে দীন দরিদ্র পরিবারের শ্যামা ঠাকরুণ হইতে বিংশ সহস্র রজতখণ্ডবার্ষিক আয়ের ভূম্যধিকারী কামাখ্যা বাবুর স্ত্রী শ্রীপ্রতিমা দেবী পর্য্যন্ত একভাবে কথা বলেন।

রাত্রি বেলা অর্ণবের সাথে দেখা। অর্ণব কহিল, কেমন লাগছে তোমার গাঁয়ে ?

ইলা মুখ খানি ভার করিয়া কহিল, মন্দ না !

—মন্দ না কেন ইলা ! পাহাড়ের কথা তুমি আজও ভুল্‌তে পারোনি।

ইলা বিবর্ণমুখে কহিল, পাহাড়ের মায়া আমায় রোজ টানে, অজানার টানে টানে আমায়, কেন জানিনা !

অর্ণব যেন আকাশ হইতে পড়িল। মাথা নাড়িয়া কহিল, ছি ইলা, অবুঝ হয়োনা। দেশের মায়া কি কারও চেয়ে কম ! এমন সুন্দর দেশ, বুনো গাছপালা, স্নিগ্ধ নদ নদী, আত্মীয় স্বজন, এর চেয়ে কি স্বর্গ বড়ো ?

ইলা সবিস্ময়ে কহিল, আমি তো কোন দিন এর মর্য্যাদা খাটো করিনি। কি যে আনন্দে আজ কয়দিন কেটে যাচ্ছে আমার, সে আমি তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আগে গ্রামে আস্‌তে আমার খুব ভয় লাগ্‌ত, এখন খুব ভালো লাগে, মনে হয়, কেন আরো আগে আসিনি। তবু কি জানি থেকে থেকে পাহাড়ের মায়ায় আমার মন ভরে উঠে। আমরা সবাই এসেছি ! শুধু তাঁর স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না, আজও ভুলতে পারিনি। সে আমায় ডাকে, কেবলই ডাকে, অশরীরী বাণীতে প্রতিদিন আমাকে ডেকে যায়, চোখের নিমেষে আমার মন উড়ে যায় শিলঙ পাহাড়ে, বাতাসের বুকে, ঝর্ণার কোলে, সরল বনের ধারে······

অর্ণব এবারের মত চুপ করিয়া গেল। শোক, দুঃখ, ব্যথা, এর কাছে দেশের মায়া তুচ্ছ নয়, তবে সময় সাপেক্ষ বটে !

কোন অজ্ঞাত সুদূরের মায়ায় ইলার কোমল মন প্রাণ হুহু করিয়া ওঠে কে জানে ! মনে হয় তার স্নেহের পুতুলির শৈশবের ক্রীড়াভূমি, কৈশোরের রম্যোত্থান, শত সহস্র গৃহের জাগর-স্মৃতি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে

মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণে তোলপাড় করিতে থাকে, মিথ্যা অজানার মোহ, মায়া, মনের কুহক, স্নেহ, মমতা জীবনের বেলা ভূমিতে ঢেউ খেলিতে থাকে। বিস্মৃতির ফেনিল উচ্ছ্বাসে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই!

রাত্রে শুইয়া ইলা এই কথাই ভাবিতে থাকে। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সে দীঘির কোলে সাঁতার কাটিয়া আসে। দীঘির কালো জল দেখিয়া সে কত খুসী, কিন্তু নিমেষেই সেই ভাব আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়, মনে পড়ে ডাগর দুটি কালো চোখ! মাঝে মাঝে সঙ্গিনীদের সাথে সে সবুজ মাঠে বেড়াইয়া আসে, কলাই শাঁকের কচি কচি পাতা সে চুপ, করিয়া চাহিয়া দেখে। ধীরে ধীরে সূর্য্য ডুবিয়া যায়, কুয়াশার মত ধোঁয়ায় সারা মাঠ ডুবিয়া, ভরিয়া একাকার হইয়া ওঠে। শেষ রাত্রিতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরে, ভূতুম পাখীর বিশ্রী ডাক সে কান পাতিয়া শোনে, বুক ধড়ফড় করে,······মনে হয় আবার কি অমঙ্গল হইবে কে জানে। পাড়ার ছেলে মেয়েরা ভোর হইতেই ছুটিয়া আসে ইলার কাছে। কত আদর, কত সোহাগ, কত স্নেহ মমতা তাহাদের জন্য,···স্বামীর কাছে বলিয়া প্রতিদিন সে কত টাকা পয়সা খরচ করে, ছেলে মেয়েরা পেট ভরিয়া সন্দেশ খায়, কমলা নিজ হাতে বিলাইয়া দেয়। নূতন জামা কাপড় পরিয়া হাসিতে হাসিতে এক ছুটে ঘরে ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যার পর এই সব দস্যি ছেলে মেয়েরা মায়ের কোলে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে কত দেশ বিদেশের রাজপুত্র, রাজ কন্যার কথা!

শিলঙ ফিরিয়া যাইতে আর মাত্র দিন দুই বাকী। ছেলেরা ছুটফট সুরু করিয়াছে এখন হইতেই, ইলার মনেও শান্তি নাই! আবার কবে আসিবে কে জানে! দেশের জন্য কেমন একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছে।

সেই মাধবী ঠাকুরঝি, শ্যামা ঠাকরুণ, ভুবন দিদি, হেমা, মালতী, বকুল, টগর সবাই যেন অদৃশ্য শক্তিতে তাহাকে টানিতেছে। সেই থিয়েটারের ছেলের দল, পাড়ার ছেলে মেয়েরা, নিতাই ঠাকুর, পরাণ সাধু, ভগবান দাদা রোজই একবার মায়ের মুখে একটুখানি হাসি দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসে। আহম্মদ চৌকিদার, নবু সেখ, ছবরালী, জবাই ঢালী তাহারাও দিনান্তে সাঁঝ রাত্রিতে বাবুর বাড়ীর বাঁধা রোয়াকে বসিয়া একপ্রহরের রাত্রিতে যখন পক্ষী বিশেষ সময় জ্ঞাপন করে, উঠিবার নামও করে না। সারাদিনের পরিশ্রম, ক্লান্তি যেন বাড়ীর উঠোনে আসিয়া পা দিলেই এক মুহূর্ত্তে চলিয়া যায়। তাহারা খুকীর সুখ দুঃখের কথা বলিয়া নিজেরা কাঁদে, ইলাকে কাঁদায়, আবার কোনদিন জারী গান গাহিয়া গভীর রাত্রে ঘরে ফিরিয়া সুখে নিদ্রা যায়।

একদিন আহম্মদ না আসিলে ইলা বার বার বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য ফাজিলাকে পাঠাইয়া দশবার খবর নেয়। নবুর পাঁচ বছরের ছেলেটির জ্বর হইয়াছে, ইলার চিন্তা হয়, তাহার ঘরে সাবু, মিশ্রী, বার্লি আছে কিনা। সে নিজেই লোক পাঠাইয়া বাজার হইতে ফল, মিশ্রী, বার্লি, খেলনা আনাইয়া দুঃস্থ প্রজাদের ঘরে ঘরে দিয়া আসিতে বলে। কেহ কেহ সাদরে গ্রহণ করে, কেহ ছুটিয়া আসিয়া "মায়ের" পায়ের ধূলো গামছার কোণে মাখাইয়া লইয়া যায়, এবং গৃহে ফিরিয়া রুগ্ন স্ত্রীপুত্রের কপালে ছোঁয়াইয়া ছেঁচার বেড়ার ফাঁকে গুঁজিয়া রাখে। পরদিন রোগের একটু উপশম হইলে এই সব নিরীহ কৃষকেরা যার যেমন সাধ্য দুধ, নলিন গুড়, কাঁচা তেঁতুল, নবান্নের জন্য নূতন ধান ধামায় করিয়া বহিয়া চাটুয্যেদের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়। না বলিলেও তাহারা কোন কথা শোনে না, বা শুনিতে চাহে না। সকলের মুখে সেই এক কথা,—মা-ঠাকরুণের জন্য। কিন্তু মা-ঠাকরুণকে তো তাহারা আজ

পর্য্যন্ত ভালো করিয়া চোখে দেখে নাই। অবগুণ্ঠনে ঢাকা হাস্যময়ী একখানি দেবী প্রতিমার দুইখানি রাঙা চরণ দেখিয়া তাহারা মনে মনে কত খুসী হইয়া ফিরিয়া যায়।

যাওয়ার দিন আর ইলা কাহারও সাথে তেমন কিছু বলিতে পারিল না। ভোরে ষ্টীমার ধরিবার জন্য গ্রাম থেকে রওনা হইতে হয়। সবে ভোরের পাখী জাগিয়া উঠিয়াছে। পাল্কী বেহারার হৈ চৈ শব্দে যে যেখানে ছিল, মাতৃহারা শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া দলে দলে সার বাঁধিয়া ষ্টেশন অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

অর্ণব হাসিমুখে প্রত্যেককে প্রত্যভিবাদন জানাইল। ইলা পাল্কীর জানালার ফাঁকে একদৃষ্টে চাহিয়া এক একবার মুখ লুকাইয়া ভিতরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই ষ্টীমার আসিয়া ছাড়িয়া দিল! কেবিনে বসিয়া ইলার চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ওই যে দত্তদের তালগাছটি কোথায় লুকাইয়া গেল, কনকসারের থাল, চন্দনকর, সবই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইযা যাইতে লাগিল।

অর্ণব কাছে আসিয়া দেখিল, ইলা তখনও কাঁদিতেছে। কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, তুমি কাঁদছ ইলা? ইলা কোন কথা বলিল না। ধীরে ধীরে কেবিনের জানালা ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অর্ণব পুনরায় কহিল, চল দেশে ফিরে যাই! দেশের জন্য তোমার মন কেমন করছে, না?

ইলার ডাগর চোখে আশ্চর্য্য মিনতি···যেন বলিতে চাহিতেছে, ওগো চল, ফিরে যাই,···অথচ খুকীর জন্যও মনটা কেমন করিতেছে।

শিলঙ না গেলেও নয়···পাহাড়ের বুকে,···পাহাড়ের কোলে···

নদীর একটা বাঁক ফিরিতেই ইলা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কেবিনের জানালা বন্ধ করিয়া দিল। গাঙের বুকে ফেনার ফুল ফুটাইয়া ঢেউগুলি তীরের বুকে আছাড়ি বিছাড়ি খাইতে খাইতে চলিয়াছিল।

কেরাণীর দুর্গোৎসব

সুরেন্দ্রনাথ হিসাব-নিকাশ অফিসের কেরাণী। সরবরাহ বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু কাগজে কলমে লিখিয়া পড়িয়া সন্ধ্যাবেলা সে পরিশ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসে। তাহার স্ত্রী কমলার বিশ্বাস, সে যখন সরকারের টাকা পয়সার হিসাব রাখে, তখন আর তাহাদের চিন্তা কি!

সংসারে আর কেহ নাই, পিতামহের আমলের এক বৃদ্ধ ভৃত্য, বিন্দু পিসী এবং একমাত্র শিশু কন্যা মিলু। ইহারা সুদূর পল্লীতে ভগবানের আশ্রয়ে থাকে। দুর্ভিক্ষে, অনশনে, রেশনের প্রকোপে এবং কণ্ট্রোলের দৌরাত্ম্যে ইহাদের মুখের দিকে চাহিবার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আর সুরেন্দ্রনাথের এমন অবস্থা নয় যে, সপরিবারে সহরে বসবাস করিতে পারে। বিন্দু পিসীর দিনরাত্রি মালাজপ করিয়া সময় কাটে, চোখে বড়-একটা দেখিতে পান না। ভৃত্য হরিহর বৃদ্ধ হইলেও যোয়ানের দাদা! বয়সের সময়ে সে কত দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছে, গাঁয়ের লোক এখনও সে কথা সহজে ভুলিতে পারে নাই। তাহার দাপটে ঘোষালদের অন্দরে আজ পর্য্যন্ত কোন চোর-ডাকাত পা ফেলিতে সাহসী হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা হরেন্দ্রনাথ এবং পিতামহ নৃপেন্দ্রনাথ এক সময়ে দস্তুরমত বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে না হইতেই সংসারের হাল ঘুরিয়া গেল। মানুষের ভালমন্দ ঘটিতে কতক্ষণ!

পিসিমার বয়স হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। কমলা বড়

আশা করিয়া থাকে, সুরেন্দ্রনাথ বৎসরান্তে পূজার ছুটিতে একবার অন্ততঃ আসিয়া সকলকে দেখিয়া যাইবে। কিন্তু সব সময় তাহা হইয়া উঠে না।

কমলা দেখিতে সাক্ষাৎ কমলার মত। টানাটানা দু'টি চোখ, এক গোছা চুল, 'হিমকল্যাণের' কল্যাণে অপূর্ব্ব কুন্তলশ্রী, ঢলঢলে মুখখানি, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, ফুলের পাঁপড়ির মত সুন্দর ঠোঁট দু'খানিতে মিষ্টি হাসি সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। কিন্তু পিসীর বাতরসের শরীর, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়। হরি বৌমার কাছে বসিয়া বাটনা বাটিয়া, তরকারি কুটিয়া, মিলুকে কোলে, কাঁধে লইয়া সন্ধ্যা বেলা পিসীমার কাছে আসিয়া রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শোনায়। সুখে দুঃখে দিন কাটে।

শরৎকাল আসিলেই বিন্দুপিসী হইতে মিলুর কোমল প্রাণখানি পর্য্যন্ত আনন্দে নাচিয়া উঠে। এবার আশ্বিনের প্রথম ভাগে পূজা, শেফালি ফুটিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ফেলিয়াছে। পুকুরের জলপদ্ম ও তীরের রক্ত কমল হাসিয়া খেলিয়া আবার শুকাইয়া যাইতেছে, আকাশের নীল বড়ো করিয়া চোখে পড়ে, মেঘের শিশুরা ধীর বাতাসে ভর করিয়া কোন অজানা দেশে উড়িয়া যাইতেছে, মিলু অবাক দৃষ্টিতে তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে।

বৃদ্ধ হরিহর এখন হইতেই দিন গণিতে সুরু করিয়াছে। স্কুল কলেজ ছুটি হইতে মাত্র আর তিন চারি দিন বাকী। নদীর ঘাটে এখন হইতেই ভিড় জমিতেছে। হরিহরও মিলুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ একবার নদীর তীরে বেড়াইতে যায়। অবোধ শিশু সে তো আর এসব জানে না, সুরেনের কখন ছুটি হইবে, কখন সে দেশে আসিতে পারিবে। মাঝ গাঙে পাল তুলিয়া কত ভিনগাঁয়ের নৌকা দেশান্তরী

হইয়া যায়, মিলু আশাভরে প্রতিদিনই চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যা হইতেই বাড়িতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া মায়ের গলাখানি ছোট দুটি নরম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিতে থাকে, মা, বাবা আজও এলো না।

কমলা সান্ত্বনার স্বরে হাসিমুখে জবাব দেয়, আজ না এসেছে, কাল আস্‌বেই আসবে, তুমি ঠিক দেখো!

মিলুর মন আবার পুলকে নাচিয়া উঠে!

ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে সনাতন মাঝি রোজই গাঁয়ে ফিরিয়া আসে। সে আর কতদূর হবে, রশিখানেক জায়গা, বড় গাঙে বাহিয়া শেষে আসিয়া তাহাদের নিজেদের গাঙে হাল ধরিয়া একটানা ভাটিতে গলুই-এর উপর বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে খাইতে বামুনডাঙার ঘাটে পাড়ি দিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা রোজই তাহার নজরে পড়ে হরিহরকে। মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া হরিহর জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সনাতন জানাইয়া দেয়, সুরুবাবু আসেনি। এলে কি আমি বাবুকে ফেলে আসব। দশটা কেরায়া থাক্‌লেও সে গাফিলতি আমার হবে না, একথা তুমি ঠিক জেনো হরিদা'!

বর্ষাকালে এই নদীর নাগর দোলায় কোন মাঝি নৌকা না দোলাইয়া চলিয়া যাইতে পারে না। ঢেউয়ের দাপাদাপি, তীরে তীরে ঝুপ ঝাপ শব্দ, সারা বর্ষা ভরিয়াই আছে! শরতের প্রারম্ভেই নদী যেন একটু পড়িয়া আসে!

মিলু যত আশাই করুক না কেন, সুরেনের এবার পূজায় বাড়ি যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে কিনা সন্দেহ। বড়বাবুর মেজাজ ভালো না, বড়সাহেব টুরে, এখন ছুটি হইবে কি না কে জানে!

সুরেন ভাবিয়া আকুল হইল। বৎসরান্তে স্ত্রীকন্যার দর্শনলাভ,

জন্মভূমির স্নিগ্ধ স্পর্শ তাহার সারা বছরের ব্যথা বেদনা ভুলাইয়া দেয়, কিন্তু এবার যাইতে পারিবে না ভাবিতেই তাহার মনপ্রাণ সহসা কাঁদিয়া উঠিল। বড়বাবুর কাছে শুধু ধর্না দিতে বাকী। মুখে, কাগজে পত্রে অনেক বলিয়া লিখিয়া দেখিয়াছে সে, এমন কি পাড়ার একজন বর্ষীয়সী রমণীকে দিয়া বড়বাবুর তরুণী, রূপসী ভার্য্যাকে অনেক রকমে তোষামোদ করিয়াও কোন সুফল হয় নাই। নানা দুশ্চিন্তা ভাবনায় সুরেন্দ্রনাথ একরকম পাগল হইবার উপক্রম হইল। হায়রে প্রবাসীর বিয়োগ-ব্যথা! এই বড়বাবুর উপর অধিকাংশ কেরাণীবর্গ একেবারে হাড়ে হাড়ে চটা। জিতু দাস এবং সহকর্ম্মী সতীশ সৎপরামর্শদানে সারা অফিসে একেবারে অদ্বিতীয়। ইহারা অডিট অফিসে কাজ না করিয়া যদি উকালতী ব্যবসা করিত, হয়ত ইহাদের পশার অল্প দিনেই জাঁকিয়া উঠিত।

জিতুদাস অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া এক বুদ্ধি বাহির করিল। সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া সতীশের সঙ্গেও এবিষয়ে তাহার কি সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। বিপদে পড়িলে মানুষের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, তাহা বেশ ভালো বোঝা যায় সুরেন্দ্রনাথকে দেখিলে! সতীশ পরামর্শ দিল যে, "মেডিকেল লিভ" না লইলে এবার ছুটি পাওয়া অসম্ভব, কোন একটা ছোট খাট রোগের ছুতানাতা না করিয়া কঠিন রোগের অবস্থা দেখাইলেই সাহেবের দয়া না হইয়া আর যায় কোথায়! তখন কোথায় থাকবে বড়বাবু আর তার হাত-ধরা বড়সাহেব!

জিতু দাসের কথামত সুরেন্দ্রনাথ দিন দুই অফিসে না আসিয়া জ্বরের ভান করিয়া বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। সতীশ ছা-পোষা লোক। অফিসে আসিয়াই বড়বাবুর কাছে সুরেন্দ্রনাথের ভয়ানক অসুখ, পারিবারিক অসুবিধা ইত্যাদি বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া মনে মনে এক-

চোট হাসিয়া লইল। জিতু দাস সমবেদনা প্রকাশ করিতেই বড়বাবু নিজে সাহেবের কাছে গিয়া ভিজা বিড়ালের মত চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিতেই বড়বাবু ফিরিয়া যাইবার ভান দেখাইয়া আবার টেবিলের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল, স্যার, আপনি খুব ব্যস্ত আছেন, আমি পরে আসব 'খন।

সাহেবের মন ভিজিয়া গেল। কহিলেন, ব্যস্ত এ ক'দিন থাকতেই হবে। ছুটি এসে পড়েছে না।

বড়বাবু মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া কহিলেন, ছুটির হিড়িক না পড়তেই সুরেনবাবু অসুস্থ বলে জানিয়েছেন। দু'দিন আগেও দেখেছি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন একটা ছুটি এলেই বাঙালীবাবুদের যত অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। কি করব স্যার বলুন! আমি আর ক'দিক দেখব। আর আপনিও খেটে খেটে······

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, সিভিল সার্জ্জনের কাছে পাঠিয়ে দিন, সত্যি অসুখ হয়েছে কিনা!

—আপনি যদি স্যার সাহেবকে একটু ফোন করে দেন, একটু ভালো করে একজামিন······

······ননসেন্স! আপনি কি বলছেন। আপনি কাজে যান!

বড়বাবু ধমক খাইয়া ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেই জিতু দাস টেবিলের সুমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বাবু চশমার ফাঁকে তেরছাভাবে অবলোকন করিয়া তিরিক্ষি মেজাজে মনের যত ঝাল জিতুদাসের উপর মিটাইয়া লইলেন। কহিলেন, আপনাদের ছুটির জন্য সাহেবকে বলে বলে আমি হয়রান। সাহেব ভয়ানক চটে গেছেন, এবার আর কারও ছুটি হচ্ছে না! আর আমিও কারও জন্য কিছু বলতে পারব না।

জিতুদাস তোষামোদে অদ্বিতীয়। নানারকম কথাবার্ত্তা বলিয়া বড়বাবুর মন নরম করিয়া কহিল, আপনি না বললে কে বলবে বলুন স্যার আমাদের জন্য!

—এই ত দেখুন, সুরেনবাবুর জন্য কত সুপারিশ করে এলুম। সাহেব রেগে মেগে বললেন, রোজ রোজ ছুটির দরখাস্ত আমি পছন্দ করি না। আর পুজোর ছুটি, বড়দিন এলেই আপনাদের যত অসুখ-বিসুখ, মা বাবা, ভাইবোনের যত দুঃসংবাদ, স্ত্রীর মরণাপন্ন অবস্থা। সাহেব আর কিছুতেই এসব বরদাস্ত করবেন না বলেছেন!

জিতুদাস হাসিতে হাসিতে কহিল, ছুটি না হয় আমাদের নাই দেবেন। কিন্তু সুরেনবাবুর অসুখ, সে কি আর না দিয়ে পারবেন!

—এমন কি অসুখ যে ছুটির প্রয়োজন হবে। সর্দ্দিজ্বর, গা ব্যথা নিয়ে আমরা আপনাদের বয়সে কত রাত্রি অবধি খেটেছি, জানেন, আর আপনারা ননীর শরীর, একটুতেই মুষড়ে যান।

জিতুদাস নীরবে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিয়া বাহিরে আসিল। এবং ছুটির পরে সতীশের সাথে এবিষয়ে পরামর্শ করিতে করিতে পথ চলিয়াছিল। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়া দুইজনে হাসিয়া বিদায় লইল। সতীশ ফিরিবার পথে টিপ্পনি কাটিয়া কহিল, যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল না হলে চলবে কেন, কি বলো জিতু দাস?

জিতু দাস মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, সে দেখা যাবে 'খন!

পূজার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। নদীর ঘাটে লোকজনের অভাব নাই, আজ বাবুরা আসিলেন, কাল শিরোমণি মহাশয় সপরিবারে আসিতেছেন, শেষরাত্রিতে লোকজন নৌকাসহ ষ্টেশনে গিয়াছে। হরকান্ত এবার আসিতে পারিবে না, তাহার মনিব বড় কড়া, তাই

ঘোষালদের বউএর মুখ ভারী। সীতানাথ ভাটিতে চাউলের কারবার করে, দুই নৌকা বোঝাই জিনিষপত্র, ছেলেপেলে সহ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু আসে নাই সুরেন্দ্রনাথ। আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবু কমলা হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, কারণ সাধারণতঃ বৈকালে ষ্টীমার বামুনডাঙা ঘাটে আসিয়া পৌঁছে।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের মুখে আর হাসি ধরেনা যেন। কেহ নূতন জামা, জুতা, কেহ নানাবিধ খেলনা, কেহ বা আত্মীয় স্বজনকে কাছে পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে ও ছেলেমেয়েদের ভিড় কম নয়। কেষ্টকুমার এইমাত্র চাল চিত্তির শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে। জগাই ঢাকী ভর সন্ধ্যায় গ্রামে পা দিয়াই ষষ্ঠীর বোধন উৎসবের বার্ত্তা সরবে জোর কাঠিতে জানাইয়া দিতেছিল। মিলুর নূতন কাপড় জামা আসে নাই, তাই সে পাড়ায় প্রতিমা দেখিতে যায় নাই। মুখখানি কালো করিয়া সে ঘরের দাবায় বসিয়া আছে। বৃদ্ধ পিসীমা কত সাধ্যসাধনা করিয়া শ্রীমতীকে ঘরের বাহির করিতে পারিতেছেন না। ছলছল চোখে চাহিয়া কমলা শুধু একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আর লক্ষ্য সর্ব্বদাই ওই নদীর দিকে,—ঘাটে কোন নৌকা আসিয়া ভিড়ে কিনা। মেয়েটির চোখেও ঘুম নাই, শেষ রাত্রিতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইলেই সে লাফ দিয়া উঠিয়া বসে, অমনি মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে, মা, বাবা এলো নাকি ?

মা তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন, কাল আস্‌বে।

কিন্তু এই 'কাল' যে আর কত দিন পরে আসিবে অবোধ

মিলু তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। বছর খানেক আগে সুরেন্দ্রনাথের বড মেয়েটি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। এক রকম বলিতে গেলে বিনা চিকিৎসায়। পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, জ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা ভালো বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সেই সময়ও সুরেন্দ্রনাথ 'তার' পাইয়া আসিতে পারে নাই। ছুটি পায় নাই, খুকীর মৃত্যুর খবর যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন নাকি দয়ালু বড়বাবু ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, একবার বাড়ী ঘুরে আসতে চাও তো যেতে পারো। সাহেব নাকি ভাল মন্দ কিছু বলেন নাই।

সারাদিন, সারারাত্রি সুরেন্দ্রনাথ মেসে বসিয়া চোখের জল ফেলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াছে। এখনও সময়ে অসময়ে তাহার চোখে বাদলধারা ঝরিতে থাকে। খুকীর কথা বড় করিয়া মনে পড়িলে সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বড় বড় যোগের খাতা লইয়া একাগ্র মনে কাজ করিতে করিতে খুকীর কথা ভুলিতে চেষ্টা করে। ভুলিতে পারে কিনা এ কথা বলা কঠিন। আর কে-ই বা ভুলিতে পারে!

কাজকর্মে সুরেন্দ্রনাথ একেবারে মোটামুটি মন্দ না। হাজার হোক একদমে বি-এ পাশ করিয়া এ অফিসে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল। উপরিওয়ালার নেকনজরে পড়ে নাই, 'লালমুখের' চোখে পড়িলে এতদিনে তাহার একটা সুরাহা হইয়া যাইত। কিন্তু কথায় আছে, 'তুমি যাবে বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে।' অদৃষ্টের বিধিলিপি তাহার এখনও কাটিতে অনেক বাকী আছে, এ কথা নাকি গাঁয়ের প্রবীণ জ্যোতিষী বিশু মুখোটি মহাশয় কম্‌সে কম বার দশেক বলিয়াছেন। শনির দশা এবং রাহুর দৃষ্টি না কি এমনি সব কি কথা বলেন। নবগ্রহ কবচ এবং নগদ সাতটাকা সাড়ে সাত আনা অতি আবশ্যক ব্যয় ছাড়া কোনমতেই রেহাই নাই।

কমলা এখন আর সে কমলা নাই। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর হইতেই সে এখন জানি কেমন আন্‌মনা হইয়া গেছে। মিলুকে সারাদিন চোখে চোখে রাখিয়া কোনমতে দিন কাটায়। মিলুর বিশ্বাস, তাহার দিদি এখনও মরে নাই, হাঁসপাতালে আছে, এ কথা নাকি পাড়ার বর্ষীয়সীরা তাহাকে বলিয়া দিয়াছে। সে সেই বিশ্বাসেই আছে, এবং মাঝে ম্যাঝে এই প্রসঙ্গ তুলিয়া মাকে এবং ভৃত্য হরিহরকে বিষম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কমলা চোখের জলে মুখ ফিরাইয়া লয়। হরিহর গান গাহিয়া তাহাকে লইয়া গ্রামের মাঝখানে ঘুরিয়া আসে। ধীরে ধীরে দিদির প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া যায়।

হায়রে চাকুরি, হায়রে পেটের দায়! এই মোহে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ শেষ সময়ে একবার স্নেহের পুতুলিকে চোখের দেখা দেখিতে পাইল না! তবু সুরেন্দ্রনাথকে 'ধন্য' বলিতে হয়। দু'এক দিন চোখের জল ফেলিয়া সে আবার মন স্থির করিয়া কাজেকর্ম্মে মন দিয়া বসিল। বড়বাবু লোকলজ্জার ভয়ে প্রথম দু'একদিন সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে সংসারের অহমিকা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং সপ্তাহ না যাইতেই অফিসে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

যে গিয়াছে, সেজন্য হায় আফশোষ করিয়া কোন ফল নাই, এ কথা জানিয়া শুনিয়াও লোকে দুঃখ করে। রক্ত মাংসের গড়া শরীর যাহাদের, তাহাদের না করিয়া উপায় নাই। চোখের জল ফেলিলে শোক দুঃখ নাকি একটু হাল্কা হইয়া যায়, একথা পাড়ার মেয়েরা সর্ব্বদাই বলাবলি করে। প্রায় প্রত্যহই সুরেন্দ্রনাথ মেসে চুপ করিয়া বসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুইয়া পড়িত। অন্যান্য সহকর্ম্মীরা আসিয়া মাঝে মাঝে কত প্রবোধবাক্যে তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত, তাহার মন প্রাণ সে কথা ভালো শুনিত কি শুনিত না, তাহা ভালো জানা যায় নাই।

ছেলেবেলা হইতেই সুরেন্দ্রনাথ নিরীহ প্রকৃতির লোক। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলেদের মত সে সিগারেট খাইয়া, আড্ডা দিয়া, তাস পিটিয়া সময় কাটাইত না। এহেন গো-বেচারী লোক আজ কালের দিনে অতি বিরল। বিবাহ হওয়ার আগে সে কোন মেয়েদের সাথে মেলামিশা করা দূরে থাকুক, তাহাদের ত্রিসীমা কোনদিন ভুলেও মাড়ায় নাই। বিবাহ অবধি সে জানে শুধু কমলা, এবং কমলা ছাড়া আর কোন তরুণীকে তাহার চোখে তেমন করিয়া চোখে পড়ে না। প্রবাসে কমলার ফটোখানি বুক পকেটে করিয়া সে পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও চোখে পড়িলে সে তাড়াতাড়ি যক্ষের ধনের মত ছবিখানি লুকাইয়া রাখিত। একবার নাকি ছবিখানি পাড়ার কোন মেয়েদের চোখে সহসা পড়িয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জায় রাঙা হইয়া তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, ইহা নিয়া তাহাদের পাশের বাড়ীর কোন মেয়ে এবং সহরের তরুণরা এবং কলেজের ছাত্রীরা রমলা ও কনক গাঙ্গুলী তাহাকে ক্ষেপাইতে কম কসুর করে নাই, তবু সে মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়া যাইত।

তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত, গরীবের আবার মান অপমান কি। পথে চলিলে ধনীর মোটর গাড়ীর কাদা সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করে, বৃষ্টি রৌদ্র তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সভ্য যুগের যান বাহন তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। অফিসে বড় বাবুর চোখ রাঙানি, গৃহে বুভুক্ষিত পরিবারের আর্ত্তনাদ, পথে ঘাটে শত সহস্র লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ইহাই তাহার জগতে প্রাপ্য। অনাদর, উপেক্ষা, অপমান তাহার পদে পদে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ আর এসব কথা ভাবিতে পারে না।

ভোরবেলা সহসা সুরেন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। আজ দুই তিন দিন তাহার নাওয়া-খাওয়া এক রকম নাই বলিলেই চলে। বেলা দশটায় কাঁটায়-কাঁটায় সে সিভিল সার্জ্জনের অফিসে গিয়া হাজির। বুকের দুরুদুরু কাঁপুনি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তবু কোনমতে আত্মদমন করিয়া চুপ হইয়া সে বসিয়া রহিল। এমন সময় সাহেব উপস্থিত হইলেন। দলে দলে লোকজন দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। প্রায় যখন সকলেরই দেখাশোনা শেষ হইয়া গেল, এমন সময় সুরেন্দ্রনাথের তলব হইল! সুরেন্দ্রনাথ অষ্টমী পূজার জীব বিশেষের মত কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, গোল-গাল চেহারা, লালমুখের হাসি, দাড়ি গোঁফ কামানো এক সাহেব চুপ হইয়া বসিয়া আছেন। সাহেবের মুখে মৃদু হাসি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রাণে জল আসিল। পরণে আধ ময়লা কাপড, ছেঁড়া জামা, রুক্ষ. মলিন চেহারা, সজারুর কাঁটার মত বিপুল কেশদাম, সুরেন্দ্রনাথ অতি ধীরে একখানি টুল ভর করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব নানা রকম প্রশ্ন ও পরীক্ষা করিয়া কোন অসুখ ঠিক করিতে না পারিয়া কহিলেন, আপনার কি অসুখ?

সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, জানিনা স্যার। তবে শরীর বড় দুর্ব্বল, রাত্রিতে ঘুম নেই, ক্ষিধে নেই……মনও এক এক সময় খুব খারাপ থাকে!

সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, ওসব যাক। কিছুদিন আগে কোন কঠিন ব্যারাম হয়েছে কি?

—আজ্ঞে না……

সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, না! এমনি ভাব কতদিন থেকে হয়েছে?

—প্রায় মাস খানেক!

সাহেব একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি তো কত রকমে আপনাকে পরীক্ষা করলুম, কোনমতেই কিছু বের করতে পাচ্ছিনে। আপনার হার্ট, ফুসফুস্ সবই ঠিক আছে। তবে কেন এমন হয়।

সুরেন্দ্রনাথ আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিল, জানিনা স্যার।

—জানেন না কি রকম। অসুখ আপনার, আর আপনি জানেন না, তবে কি আমি জান্‌ব?

—সেই জন্যেই তো স্যার আপনার কাছে আসা!

সাহেব মাথা নাড়িলেন, সে তো সত্যি কথা!

একাগ্র মনে সব কথা শুনিয়া সাহেব নিবিষ্টচিত্তে একটুখানি ভাবিয়া কহিলেন, আপনি বিয়ে করেছেন?

—হাঁ।

—আপনার স্ত্রী কোথায়? এখানে আছেন?

—না, দেশে।

—কতদূরে আছেন?

—প্রায় চারশো' মাইল দূরে!

—কতদিন দেখা হয়নি?

—দু' বছর।

সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, Oh my God!

—দেশে যাননি কেন, ঝগড়া হয়েছে নাকি?

—সাহেব, ছুটি পাইনি, তাই যাওয়া হয় না। গেল বছরও আমার বড় খুকী যখন মারা যায়......বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব তাহাকে হাতে ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন এবং নিজে ভ্রূকুঞ্চিত

করিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, সেই থেকে তোমার শরীর খারাপ না,……আচ্ছা, সেরে যাবে, কোন ভয় নেই। দিন কয়েক অন্য কোথাও থেকে ঘুরে এসো, আমি তোমাকে পনেরো দিনের ছুটি দিচ্ছি। আর কিছু টনিক ওষুধ খাওয়া মন্দ নয়, এই যে আমি লিখে দিচ্ছি। তোমার যত মানসিক অশান্তি !……

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ সাহেবকে সব কথা খুলিয়া বলিল। সাহেব নিজেও প্রবাসী, চিরকুমার, বিরহের ব্যথা অতশত বুঝিতে না পারিলে ও জানেন। সব কথা শুনিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন মাত্র। সুরেন্দ্রনাথের পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে।

বেলা সাড়ে দশটায় ঢাকা মেল ছাড়ে। সুরেন্দ্রনাথ যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তখন সাড়ে আটটার বেশী বাজে নাই। সোনালী রৌদ্রে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঝিলিমিলি খেলিতেছিল। পথে পথে বন করবীর ঝাড় ও দোপাটি অনাদৃত ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ছাড়িয়া যাইতেই জিতুদাস ও সতীশ রুমাল উড়াইয়া তাহাকে অভিনন্দন জানাইল। তাহাদের পূজার ছুটি হয় নাই। চির প্রবাসে থাকিয়া দিন কাটাইতে হইবে।

মেডিকেল সার্টিফিকেট খানা বড় বাবুর হাতে আসিয়া পৌছিতেই তিনি একেবারে থ' খাইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি সাহেবের কাছে ছুটিয়া যাইতেই সাহেব বিরক্তির সুরে বড়বাবুকে দু' চারিটি গালি গালাজ করিয়া বিদায় দিলেন। জিতু দাস কান পাতিয়া সে সব কথা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। বড় বাবুর সাথে দেখা হইতেই বড় বাবু ফোকলা দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, অনেক কষ্টে ছুটি মঞ্জুর করে নিয়ে এলাম……এই আপনাদের সুরেন বাবুর।

জিতুদাস ও তাহার সহকর্ম্মীরা টেবিলের নীচে মুখ রাখিয়া হাসিতে লাগিল।

* * * *

বামুনডাঙার ঘাটে একখানি নৌকা ভিড়িতেই মিলু ও হরিহর সাড়া পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘোষাল বাড়ীর সপ্তমী পূজার পাঠা স্নান করানো হইয়াছে, সেখানে যত ছেলেমেয়ের ভিড়,……রমাপুতি মায়ের মণ্ডপে মাথা ঠেকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, যজ্ঞেশ্বর ঢাকীর জোর কাটিতে গ্রাম সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। পিসীমার তাড়নায় কমলা প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছিল। মোক্ষদা মাসী নদীর ঘাটে স্নান সারিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার কাছে সুরেন্দ্রনাথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কমলার কথা আর ভালো করিয়া না বলিলে ও চলে বোধ করি।

চাটুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে তখন আরতির বাদ্যের বাজনা শোনা যাইতেছিল, ধিন্‌তা ধিন্, ধিন্‌তা ধিন্……জগাই ঢুলি বাবরী চুলের গোছা নাড়াইয়া নাচিতে নাচিতে ঢাক বাজাইয়া নিজেও মুখে বোল দিতেছিল, ধিন্‌তা ধিন্……ধিন্‌তা ধিন্……তাধিন্ তাধিন্, তা……

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসরাজী সম্বন্ধে

সাহিত্য-সাধনায় সফলতা লাভ করো, এই কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮।১১।৩৯

লেখকের অনুভূতি বিশ্লেষণ এবং বিন্যাস কৌশল প্রশংসনীয়—

আনন্দবাজার

মহামহোপাধ্যায় **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** পূর্ব্বাভাষে বলিয়াছেন,—লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্** এম্. এ., বি. এল্., ডি-লিট্, ডিপ্লোফোন্ (প্যারী) মহোদয় বলেন,—শিলঙের প্রিয়দর্শন কবি শ্রীমান্ হেম চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসরাজী স্বপ্নলোকের স্মৃতিবিজড়িত ছন্দে গাঁথা কথা ও কাহিনী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, **ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার** এম্. এ., পি-এইচ্. ডি. মহোদয় বলেন, গতানুগতিক ভাব ত্যাগ ক'রে তুমি একটি নূতন পথে অগ্রসর হয়েছ।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী বলেন, তোমার সোণার লেখনী জয়যুক্ত হোক।

প্রবীণ সম্পাদক (দেশ) **শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন** বলেন,—শ্রীযুক্ত হেম চট্টোপাধ্যায় প্রাণের সকল দরদ দিয়ে লিখেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অগ্নিময় আকুতি তাহার অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁর লেখা ফাঁকা অনুকৃতি নহে,……ইনি সত্যকার দৃষ্টি পেয়েছেন এই হিসাবেই স্রষ্টা এবং সাহিত্যিক।

ছোটদের কয়েকখানি ভাল বই

কামালের গড়া দেশ

সতীকুমার নাগ

তুর্কীবীর কামালের জীবন চরিত—

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সরল ভাষায় লেখা—মূল্য চৌদ্দ আনা

হেমেন রায়—**যক্ষপতির রত্নপুরী**—মূল্য ১৲

হেম চট্টোপাধ্যায়—**ভণ্ডুলরামের দিগ্বিজয়**—মূল্য ১৲

সবিতা দেবী—**ঝরণা**—মূল্য ৷৵০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—**দিন দুপুরে ডাকাতি**—মূল্য ৸০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—**অমৃতের সন্ধানে**—মূল্য ৸৵০

বিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—**মাঠের বাড়ীর ভুত**—মূল্য ৸০

কো-অপারেটিফ বুক ডিপো

কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা